প্রথম মুদ্রণ ঃ
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

প্রকাশক ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭এ কারবালা ট্যাংক লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
নির্মলেন্দু মণ্ডল

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস
কলিকাতা-৬

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধাবলীর প্রকাশকাল

ভারতশিল্পের ইতিহাস	॥	সাহিত্য, ১৩১৯, ১ম সংখ্যা
ভারতশিল্পের বর্ণপরিচয়	॥	মানসী, চৈত্র, ১৩১৯, ২য় সংখ্যা
ভারতশিল্প চর্চ্চার নববিধান	॥	ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১৯, ২য় খণ্ড, দশম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
ভারতশিল্প তত্ত্ব (১)	॥	সাহিত্য, ১৩২৯, ৪র্থ সংখ্যা
ভারতশিল্পতত্ত্ব (২)	॥	সাহিত্য, ১৩২৯, ৫ম সংখ্যা
ভারতশিল্পের মূলসূত্র	॥	বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯
ভারতীয় শিল্পাদর্শ	॥	সাহিত্য, ২২শ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা
ভারত শিল্পসম্ভার	॥	প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩০৯, ১ম সংখ্যা
ভারত চিত্রচর্চ্চা	॥	ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩২৯, ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বঙ্গভাস্কর্য্য নিদর্শন	॥	ভরতবর্ষ, চৈত্র, ১৩২৯, ২য় খণ্ড, ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

প্রবন্ধ-সূচী ॥

প্রকাশকের নিবেদন

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মৃত্যুর বাহান্ন বছর পর এই প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল তাঁর ভারত-শিল্প সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি। গৌড়বিবরণমূলক অনেকগুলি প্রবন্ধ অক্ষয়-কুমার নানা পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন; সে প্রবন্ধগুলিও বই-আকারে প্রকাশের পরি-কল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি।

বন্ধুবর শ্রীসুনীল দাস দীর্ঘ দিন পরিশ্রম করে বর্তমান বইটির প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ ও সংকলন করে দিয়েছেন; 'ভারতশিল্পের কথা' এই নামকরণও করেছেন তিনি। শ্রদ্ধেয় ড. কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রবন্ধগুলির পারম্পর্য স্থির করে দিয়েছেন।

এই বই-এর একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ড. দীনেশচন্দ্র সরকার।

এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

নেপাল ঘোষ

ভূমিকা

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) তাঁর জন্ম-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গবেষক ছিলেন। তাঁকে বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক গবেষণার পথপ্রদর্শক বলা যায়। ১৮৮৫ সালে ২৪ বৎসর বয়সে তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে আইনপরীক্ষা পাশ করে রাজশাহী শহরে ওকালতি আরম্ভ করেন। শীঘ্রই ওকালতি ব্যবসায়ে তাঁর প্রচুর পসার হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবেই তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক। প্রথমে তিনি মধ্যযুগ নিয়ে গবেষণা করতেন। ১৮৯৮ সালে তাঁর 'সিরাজ উদ্দৌলা' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে বাংলার শিক্ষিতসমাজে ঐতিহাসিক হিসাবে অক্ষয়কুমারের নাম বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত 'মীর কাশিম' নামক গ্রন্থ তাঁর গবেষণার খ্যাতি আরও বর্ধিত করে। কারণ এই দুখানি বইতে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার এই দুজন নবাবের চরিত্রে অন্যায়ভাবে কলঙ্ককালিমা লেপন করেছেন। এরপর প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

১৯১০ সালে রাজশাহী জেলার দীঘাপতিয়ার রাজকুমার শরৎকুমার রায় এবং রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়দ্বয়ের সহযোগিতায় অক্ষয়কুমার রাজশাহী শহরে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' স্থাপন করেন। শরৎকুমার সমিতির সভাপতি, অক্ষয়কুমার ডাইরেক্টর এবং রমাপ্রসাদ সেক্রেটারি। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল পুরাকীর্তির নিদর্শন সংগ্রহ—যেমন (১) পুরাতন স্থাপত্যের নিদর্শন, (২) পুরাতন ভাস্কর্যের নিদর্শন এবং (৩) পুরাতন জ্ঞান-ধর্ম-সভ্যতার নিদর্শন (অপ্রকাশিত ও অপরিজ্ঞাত হস্তলিখিত গ্রন্থ)। সংগৃহীত পুরাবস্তুসমূহ সমিতির কার্যালয় বা সংগ্রহালয়ে স্থান পেত। শীঘ্রই সমিতি অনুসন্ধান-লব্ধ এবং পূর্বাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য একত্র সন্নিবিষ্ট করে 'গৌড় বিবরণ' নামক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিতব্য গ্রন্থ সঙ্কলনের প্রয়োজন অনুভব করে। আটভাগে এই বিবরণ গ্রন্থনার পরিকল্পনা হয়—(১) রাজমালা, (২) শিল্পকলা, (৩) বিবরণমালা, (৪) লেখমালা, (৫) গ্রন্থমালা, (৬) জাতিতত্ত্ব, (৭) শ্রীমূর্তিতত্ত্ব এবং (৮) উপাসকসম্প্রদায়। এর মধ্যে ১৯১২ সালে রমাপ্রসাদের 'গৌড়রাজমালা' এবং অক্ষয়কুমারের 'গৌড়লেখমালা' প্রকাশিত হয়ে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করে। আজও পালযুগের ইতিহাস রচনায় আমরা অক্ষয়কুমারের 'গৌড়লেখমালা'র সাহায্য নিতে বাধ্য হই।

ছ-সাতখানি পুস্তকব্যতীত অক্ষয়কুমার তৎকালীন প্রখ্যাত মাসিক পত্রগুলিতে অগণিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং ১৮৯৯ সালে 'ঐতিহাসিক চিত্র' সংজ্ঞক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা আরম্ভ করেন। বাংলাভাষায় এটাই বোধহয় সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক গবেষণাপত্রিকা। অক্ষয়কুমারের ইংরেজী রচনার মধ্যে ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার কর্তৃক The Monuments of Varendra তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়। এটি ১৯২৭ সালে কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহশালায় উত্তরবাংলার স্থাপত্যশিল্পের উপর অক্ষয়কুমার প্রদত্ত বক্তৃতা।

অক্ষয়কুমার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। উপরে উল্লিখিত 'গৌড়লেখমালা'য় পালরাজবংশের ১৭ খানি শিলালেখ-তাম্রশাসন সম্পাদনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৫ সালে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেট হলে তিনি The Fall of the Pala Empire শীর্ষক কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' নামক দ্ব্যর্থকাব্যের কতকগুলি শ্লোকের উল্লেখনীয় ব্যাখ্যা ছিল। এই বক্তৃতামালা এখনও প্রকাশিত হয় নি। তবে রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মাসিক 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার চারটি সংখ্যায় (ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ) এগুলির সারাংশ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সম্প্রতি ক্ষিতীশচন্দ্র সরকারের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি পেয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা এই বক্তৃতামালা প্রকাশের চেষ্টা হচ্ছে। অক্ষয়কুমার খ্যাতির অনুরূপ সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্টসদস্য নির্বাচিত হন (১৩১৮ বঙ্গাব্দ)। তদানীন্তন ভারত সরকার তাঁকে C.I.E. (Companion of the Order of the Indian Empire) উপাধি এবং Kaiser-i-Hind স্বর্ণপদক (১৯১৫) দিয়েছিলেন।

শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে অক্ষয়কুমারের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং ভাস্কর্যাদির শিল্পচাতুর্যেরও তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর বোদ্ধা ছিলেন। সম্প্রতি 'সাহিত্যলোক'-এর সত্ত্বাধিকারী শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত অক্ষয়-কুমারের শিল্পকলাবিষয়ক প্রবন্ধমধ্যে দশটি একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আমাকে এই ক্ষুদ্র বইখানির একটি ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করলে আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়েছিলাম। কারণ তাতে অক্ষয়কুমারের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশের একটা সুযোগ পাওয়া গেল। ছাপা ফর্মাগুলি পড়ে আমি মুগ্ধ হলাম। অক্ষয়কুমারের

রচনার পরিপাট্য, ভাষার মাধুর্য ও আড়ম্বরহীনতা এবং বিষয়বস্তুর উপর তাঁর গভীর অধিকার অন্যত্র আশা করিনে। সর্বোপরি স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুঃখের বিষয়, মুদ্রণাশুদ্ধির বাহুল্যের জন্য আমাকে একটা শুদ্ধিপত্র তৈরী করতে হল। আসল কথা এই যে, কোনও মৃত লেখকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার পুনর্মুদ্রণ শুদ্ধভাবে সম্পন্নকরার উপযুক্ত লোক এখন দুর্লভ।

প্রবন্ধগুলি প্রকাশের পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে নূতন আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে পরিবর্তনের প্রয়োজন তাঁর প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ক রচনার তুলনায় বর্তমান গ্রন্থে কম। শিল্পের ষড়ঙ্গকতা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'শুক্রনীতিসার'-এর সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল মতবাদের সমালোচনায় অক্ষয়কুমার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। (পৃ ১৮ ; দ্রষ্টব্য পৃ ২৯, ৩৭)। কিন্তু আজ হলে আর তার দরকার হত না। কারণ এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, এ গ্রন্থ উনবিংশ শতাব্দীতে জালকরা ধর্মশাস্ত্র। L. Gopal প্রণীত The Sukraniti a Nineteenth Century Text, Varanasi, 1978 দ্রষ্টব্য। যাঁরা বলেছেন যে, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলীতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের নিয়মাবলী লঙ্ঘিত হয়েছে, অক্ষয়কুমার তাঁদের অগ্রণী ছিলেন।

অক্ষয়কুমার যখন লিখেছিলেন তখন বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী কালের কোনও চিত্র বা প্রতিমা জানা ছিল না (পৃ ৫৩)। কিন্তু কিছু ছিল না তা তিনি মেনে নেন নি (পৃ ৫৭)। পরে ১৯২২-২৭ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধু উপত্যকায় প্রাগৈতিহাসিক আমলের সীলমোহরের চিত্রাদি ও মূর্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়। সিন্ধু উপত্যকার এই অনার্য সভ্যতা বৈদিক আর্য সভ্যতা থেকে উন্নত ছিল। পূর্বের মতামতের জন্য ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বাঙালীরা যাকে বলেন 'অজন্তা' (পৃ ৭১, ৭২), সে নামটির প্রকৃত স্থানীয় উচ্চারণ 'অজণ্টা'।

'বঙ্গভাস্কর্য নিদর্শন' সংজ্ঞক নিবন্ধে (পৃ ৮৪ থেকে) অক্ষয়কুমার কেবল উত্তরবাংলায় আবিষ্কৃত মূর্তির উল্লেখ করেছেন। যা হোক, তখন বাংলার অন্যান্য স্থানে আবিষ্কৃত ভাস্কর্যের নিদর্শন ততটা ভাল জানা ছিল না। কিন্তু পরে নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক বাংলার পূর্বদক্ষিণ অঞ্চলে আবিষ্কৃত এবং ঢাকা সংগ্রহালয়ে রক্ষিত পাল-সেন যুগের অপূর্ব প্রস্তরমূর্তিমালার তালিকা (ঢাকা, ১৯২৯) প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের Eastern Indian School of Medi-

eval Sculplure (Mem. A.59, No. 47, Delhi, 1933) বইখানিরও উল্লেখ প্রয়োজন। তারও পরে দক্ষিণবাংলায় ২৪-পরগণা জেলার বেড়াচাঁপা, মেদিনীপুর জেলার তমলুক প্রভৃতি স্থানে গুপ্ত ও প্রাগ্‌গুপ্ত যুগের অগণিত উচ্চ-শ্রেণীর মৃন্ময়মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এখন দেখা যায় যে, বাংলার শিল্প-কলার ইতিহাসে উত্তর বাংলার দানের বিশিষ্ট মর্যাদা আছে বটে; কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের দানের মূল্যও মোটেই কম নয়। পাল, চন্দ্র ও সেন-বংশীয় রাজগণের আমলে প্রতিষ্ঠিত লেখসংবলিত মূর্তি দক্ষিণপূর্ব বাংলাতেই বেশী পাওয়া যায়। কুমিল্লার নিকটবর্তী ময়নামতীর বৌদ্ধ-বিহারটি আকারে সুবিশাল। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের গ্রন্থে দেখা যায়, ধর্মপালের রাজত্বকালীন বরেন্দ্রের দুজন প্রখ্যাত শিল্পাচার্য ধীমান্ ও তৎপুত্র বিৎপালের শিল্পকলার মধ্যে নাকি স্বাতন্ত্র্য ছিল এবং একজনের শিল্পকার্য বঙ্গালদেশে ও অপরজনের কৃতি মগধে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

'বঙ্গভাস্কর্য নিদর্শন' প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার রাজশাহী জেলায় প্রাপ্ত বিজয়সেনের (আ ১০৯৬-১১৫৯ খ্রী) দেওপাড়া প্রশস্তির সাক্ষ্য আলোচনা করেছেন। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাহলে দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে আবিষ্কৃত নয়পালের রাজত্বকালীন (আ ১০২৭-৪৩ খ্রী) মূর্তিশিবের প্রশস্তির সাক্ষ্যে বিশেষ আনন্দিত হতেন। এতে উত্তরবাংলার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে মূল্যবান্ তথ্য আছে। বলা হয়েছে যে, বাণগড়ে একটি 'মেরু' জাতীয় বিশাল মঠ নির্মাণ করে রাজা নয়পালের পিতা প্রথম মহীপাল সেটি দুর্বাসা সম্প্রদায়ের গোলগীমঠ-সম্পৃক্ত শৈবসাধু ইন্দ্রশিবকে সেটি দান করেন। এই মঠের সঙ্গে সম্পর্কিত কতকগুলি অভ্রংলিহ শিখরবিশিষ্ট মন্দির এবং কয়েকটি বৃহৎ দীর্ঘিকা ছিল। ইন্দ্র-শিবের শিষ্য সর্বশিব নয়পালের গুরু ছিলেন। সর্বশিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শিষ্য মূর্তিশিব কতিপয় অত্যুচ্চ শিখরসমন্বিত মন্দির নির্মাণ ও দীর্ঘিকা খনন করেন। প্রধান মন্দিরের চিলকোঠায় একটি সিংহমূর্তি স্থাপন করা হয়। সেটি নাকি সজীব বলে ভ্রম হত। মূর্তিশিবের একটি মূর্তি ঐ মন্দিরে সন্নিবিষ্ট হয়। বাংলার শিলালেখ-তাম্রশাসনাদিতে মনুষ্যমূর্তির উল্লেখ এই প্রথম বলে মনে হয়।



অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০)

ভারতশিল্পের ইতিহাস

মানবসমাজ স্বভাবতই সৌন্দর্য্যপ্রিয়। অত্যন্ত অসভ্য মানবসমাজেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও দেশকালের প্রচলিত প্রভাব সকল শ্রেণীর মানবসমাজকেই নানা উপায়ে সৌন্দর্য্য-সম্ভোগের জন্য লালায়িত করিয়া থাকে। সেই লালসা স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য বলিয়া, তাহার তাড়নায় মানবসমাজে বিবিধ শিল্পকৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। কোন সময়ে ইহার আরম্ভ, কেহ তাহার কালনির্ণয় করিতে পারেন না। যত পুরাকালের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই বুঝিতে পারা যাইতেছে,—কোনও কালেই মানবসমাজে শিল্পকৌশলের অভাব ছিল না।

এই কৌশল ক্রমে ক্রমে উদ্ভাবিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছে। যে যুগে কেবল প্রয়োজন-সাধনের উপযোগী নিত্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতেই মানবচেষ্টা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িত, সেই যুগেও—নিত্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রী গঠনেও,—মানবপ্রতিভা তাহাকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিত, কেবল প্রয়োজন-সাধনের উপযোগী করিয়া কোনও ক্রমে গড়িয়া তুলিবামাত্র নিরস্ত হইতে পারিত না। সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হইবামাত্র মানবসমাজ বিনা প্রয়োজনেও রচনা-কার্য্যে চিত্ত-বিনোদন করিত; তাহাকে বিলাসের সামগ্রীতে পরিণত করিয়া, ঘর-সংসারকে সুন্দর করিয়া তুলিবার আয়োজন করিত। এই সকল কারণে, শিল্পের ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভারত-শিল্পের ইতিহাস সংকলিত না হইলে, ভারত-সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে না। ইহা সত্য হইলেও, এ কথা এখনও আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের হৃদয়ংগম হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না।

দেশের লোকে এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলেও, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এতদিন একখানি ভারতশিল্পের ইতিহাস সংকলিত করিবার জন্য যত্ন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারাও একটি কারণে এতদিন এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের অগণ্য মূর্তিশিল্পের সন্ধানলাভ করিয়াও, এত দিন উদাসীন ছিলেন কেন, তাহা প্রথমে বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ বিষয়ের গ্রন্থ রচনার প্রথম প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থেই ইহার কারণ উদ্ঘাটিত হইয়া রহিয়াছে। ওয়েস্টমেকট এইরূপ একজন গ্রন্থকার। তাঁহার ভাস্কর্যশিল্প-বিষয়ক[১] সুবিখ্যাত গ্রন্থ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে,—

"There is no temptation to dwell at length on the Sculpture of Hindustan. It affords no assistance in tracing the history of art and its debased quality deprives it of all interest as a phase of Fine Art, the point of view from which it would have to be considered."

ওয়েস্টমেকটের এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত মনে করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ভারতশিল্পকে সমুন্নত শিল্পকলার নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত ছিলেন। সুতরাং ভারতশিল্পের ইতিহাস-সঙ্কলনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই বলিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ শিল্পজাত দ্রব্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন ; এক শ্রেণী কলালালিত্যের আধার ; আর এক শ্রেণী কেবল কারু-কার্য্যের আধার। তাঁহারা আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যকে শিল্পের নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করেন না ;—তাহা 'পণ্য' নামেই কথিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যকেই পণ্য-দ্রব্য বলিয়া মনে করিতেন ; তাহার মধ্যে সমুন্নত শিল্পকলার পরিচয় প্রাপ্ত

হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া স্বীকার করিতেন না। যে যুগে এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবগণের চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিচিত ছিল, সে যুগে তাঁহাদের অপরাধ ছিল না। তখনও ভারতবর্ষের শিল্প-নিদর্শনগুলি যথাযোগ্যভাবে পরীক্ষিত হইতে পারে নাই বলিয়া, তাঁহারা তাহার মর্যাদা-নির্ণয়ের সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই

ভারতবর্ষের প্রকৃত শিল্পকলা বিকশিত হয় নাই, এই ধারণা এতই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যদেশে ভারতশিল্পদ্রব্যের অদ্বিতীয় অনুরাগী বলিয়া সুপরিচিত, সেই সার জর্জ বার্ডউড পর্য্যন্ত [ত্রিংশৎ বর্ষ পূর্বে] অকুতোভয়ে বলিয়া-ছিলেন,—"কি ভাস্কর্য্য, কি চিত্র, কিছুই ভারতবর্ষের কলাশিল্পের পরিচয়-বিজ্ঞাপক বলিয়া কথিত হইতে পারে না।"[২]

ইহার পর ইউরোপে ও আমেরিকার প্রাচ্য-তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য এক অভিনব প্রয়াস প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বহুদেশের বহু পণ্ডিত প্রাচ্য ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিয়া, তথ্য-সংগ্রহে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের যত্নে যবদ্বীপের একটি বুদ্ধমূর্ত্তির চিত্র বিলাতের শিল্প-সভার[৩] প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। সকলেই তাহাকে শিল্পকৌশলের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, সার জর্জ বার্ডউড অম্লানবদনে বলিয়াছিলেন,—

"The senseless similitude, by its immemorial fixed pose, is nothing more than an uniuspired brazen image vacuously squinting down its nose to its thumbs, knees and toes. A boiled suet pudding would serve equally well as a symbol of passionate purity and serenity of soul."[৪]

সার জর্জের এই উক্তি সমগ্র ভারতশিল্পের প্রকাশ্য অপবাদ বিঘোষিত করিবামাত্র, বিলাতের ত্রয়োদশ জন রসজ্ঞ শিল্পাচার্য্য "টাইমস্" পত্রিকায়

ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহারা লিখিয়াছেন,—

"We the undersigned artists, critics and students of art···find in the best art of India a lofty and adequate expression of the religious emotion of the people, and of their deepest thoughts on the subject of the divine" (Times, Feb 28, 1910)

এই প্রতিবাদ কেবল ত্রয়োদশ জন শিল্পাচার্য্যের প্রতিবাদ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। ইহাই আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কারণ, অনেকেই এখন ভারতশিল্পের মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। অধ্যাপক হাভেল, ডাক্তার কুমারস্বামী প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থ-পাঠেও অনেকের অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন,— "ভারতশিল্প এক নূতন শিল্প-জগতের সন্ধান প্রদান করিয়াছে।"

এত কালের পর! তথাপি ইহাকে সুলক্ষণ বলিতে হইবে। তাহার প্রথম ফল প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহোদয় একখানি "ভারতশিল্পের ইতিহাস" প্রকাশিত করিয়াছেন।[৫] এই গ্রন্থই ভারত-শিল্পের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। তজ্জন্য ইহা সর্ব্বত্র সংবর্দ্ধনা লাভ করিবে। ইহার সকল কথাই আমাদের কথা। সুতরাং ইহার সমালোচনা আবশ্যক।

ভিন্সেণ্ট স্মিথের নাম আমাদের দেশে সুপরিচিত। তিনি আমাদের দেশে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-সঙ্কলনে যেরূপ অধ্যাবসায়ের ও বিচার-শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। তাঁহার গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থরূপে পরিগৃহীত হইয়া, ছাত্রসমাজেও সুপরিচিত হইয়াছে। ভ্রম-প্রমাদের অভাব না থাকিলেও, সেই গ্রন্থই এখন প্রধান গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ভারতশিল্পের ইতিহাস-বিষয়ক সদ্যঃ-প্রকাশিত গ্রন্থখানিও

সেইরূপ সমাদর লাভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই।

এই গ্রন্থের সকল কথা এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত ইতিহাসের কথা বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। তথাপি প্রথম উদ্যম বলিয়া এরূপ গ্রন্থ-রচনার বাধা বিপত্তির কথা স্মরণ করিলে, ইহাকে সংবর্দ্ধনা করিতে হইবে। ইহাতে অনেক স্থলেই গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত মতামত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; অনেক মতামতের অনুকূল প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সে সকল কথা উপেক্ষা করিলেও, এই গ্রন্থে জানিবার কথার, শিখিবার কথার, এবং ভাবিবার কথার অভাব নাই।

প্রথম কথাই প্রধান কথা। তাহা ভারতশিল্পের ইতিহাস-সঙ্কলনের প্রয়োজনের কথা। এরূপ গ্রন্থের যে কিরূপ প্রয়োজন, তাহা ইহাতে বিশদভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে, তাহার শিল্প কৌশলকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সরল সত্যটি ভারতবর্ষের অধিবাসিগণকেই ভাল করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে। কারণ, এখনও অনেকের ধারণা,—কারুকার্য্যময় ভাঙ্গা পাথরের টুকরা কুড়াইয়া কি হইবে? সেদিন বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনেও এই কথা সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিল।

যে পরিপাটীর সাহায্যে লোকে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার নাম "ভাষা",—এইরূপ একটি ব্যাখ্যা সংস্কৃত সাহিত্যে পরিচিত আছে। এই লক্ষণা সংকীর্ণ লক্ষণা নহে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়,—ইঙ্গিত সঙ্গীত, কথোপকথন, লিখনপ্রণালী, চিত্র ও ভাস্কর্য্য সমান ভাবেই ভাষা-পদবাচ্য। যে উপায়ে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়, তাহাকেই "ভাষা" বলিতে হইলে, চিত্রকে ও ভাস্কর্য্যকে ভাষা বলিতে ইতস্ততঃ করিব কেন? তাহারও ব্যকরণ আছে, অভিধান আছে, ছন্দ আছে, যতি আছে, অলঙ্কার-শাস্ত্র আছে,—তাহাকেও এক শ্রেণীর কাব্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার মধ্যে পুরাকালের কত ভাব, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত শিক্ষা দীক্ষা, কত লোকচরিত্র প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার

আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইলে, ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে কেমন করিয়া?

এই উপায়ে গ্রীস, মিশর, বাবিলন প্রভৃতি কত দেশের বিলুপ্ত পুরাকাহিনী সঙ্কলিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার কথা স্মরণ করিলেও, আমাদের ঔদাসীন্য বিদূরিত হইতে পারে। ইতিহাস এখন আর ঘটনাবিবৃতির তালিকা মাত্র বলিয়া কথিত হয় না। তাহা মানব-মনের ক্রমবিকাশের চিত্রপট;—শিল্পনিদর্শনগুলিকে উপেক্ষা করিলে, সে চিত্রপট যথাযথরূপে অঙ্কিত হইতে পারে না। আরও একটি কারণ আছে;—পুরাকালের সাহিত্য পুরাকাহিনী-সঙ্কলনের প্রধান অবলম্বন হইলেও, সকল বিষয়ে তাহাকে নিঃসংশয়ে অবলম্বন করা যায় না। তাহাতে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত মতামতের ছায়া অনেক সময়ে সত্যকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে। যাহা হওয়া উচিত, তাহাতে তাহারই প্রাধান্য থাকে,—যাহা সত্য সত্যই বর্ত্তমান ছিল, তাহা বহু ক্লেশে বাছিয়া বাহির করিতে হয়। শিল্পের নিদর্শন সেরূপ নহে। তাহা দেশপ্রচলিত সর্ব্বলোক-নমস্কৃত শিক্ষা-দীক্ষার ধ্যান-ধারণার অমোঘ নিদর্শন। লিখিত সাহিত্যের সাহায্যে শিল্পনিদর্শনের, এবং শিল্পনিদর্শনের সাহায্যে লিখিত সাহিত্যের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেই, আমরা পুরাকালের প্রকৃত চিত্রের সন্ধান লাভ করিতে পারি। কেবল লিখিত সাহিত্যেই বাল্মীকি-ব্যাস ও কালিদাস-ভবভূতি আবির্ভূত হন নাই; শিল্পসাহিত্যেও অনেক মহাকবির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের নামগোত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, তাঁহাদের রচনাগৌরব ক্ষুন্ন হয় নাই।

যাঁহারা কথা গাঁথিয়া, অবাঙ্মনসগোচরকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়াও, বাক্যে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়া, ঋষিপদবাচ্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, যাঁহারা অরূপকে রূপের আভাসে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবজ্ঞাত হইবেন কেন? বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, কাব্য, নাটক, দর্শন, গণিত আলোচিত হইবে; আর অজন্তা, অমরাবতী, খণ্ডগিরি প্রভৃতি অনালোচিত থাকিবে কেন?

তাহার আলোচনার চেষ্টাকে উপহাস করা সহজ ; তাহার প্রয়োজনকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এক সময় অভিজ্ঞানশকুন্তল ভাষান্তরিত হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে প্রেরিত হইবার পর, ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যের অনুসন্ধান কার্য্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর আগ্রহ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। সম্প্রতি ভারতশিল্পের পুরাতন নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াও, সেইরূপ অনুসন্ধান-চেষ্টা প্রচলিত করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা সভ্য সমাজে বিজ্ঞ বিচক্ষণ বলিয়া সুপরিচিত, তাহারাও কারুকার্য্যখচিত ভাঙ্গা পাথর কুড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। আমাদের দেশে তাহার কথা "অরসিকেষু রহস্যানিবেদনম্" হইলেও, সভ্য সমাজে তাহার কথা এখন সমাদরলাভের যোগ্য বলিয়াই মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইতেছে। যাঁহারা এতকাল বলিতেন,— "ভারতবর্ষে নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা ভাষা, নানা আচার ব্যবহার," এখন তাঁহারাই বলিতেছেন,—"এ সকল বর্ত্তমান থাকিলেও, সমগ্র ভারতবর্ষের যে একটি নিজস্ব চরিত্র সত্তা বর্ত্তমান আছে, ভারতশিল্পে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে।"

শিল্পের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্য যেরূপ উজ্জ্বলভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে ইহার প্রতি সংশয়-প্রকাশের উপায় নাই।

আমরা এক। জাতিভেদ, ভাষাভেদ, ধর্ম্মভেদ, আচারভেদ, তাহার অন্তরায় হইতে পারে নাই। এই ঐতিহাসিক সত্যটির মধ্যেই ভারতবর্ষের মুক্তিমন্ত্র নিহিত রহিয়াছে। শিল্পে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া, সাহিত্যালোচনার ন্যায় শিল্পালোচনাও নব্যভারতের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে, শিল্পাদর্শের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, জাপান-নিবাসী কাকাসু ওকাকুরা সভ্য সমাজকে শুনাইয়া দিয়াছিলেন,[৮]—"আমরা এক, সমগ্র আসিয়ানিবাসী জনসাধারণই এক", এবং শিল্পের মধ্যেই সেই ঐতিহাসিক সত্য প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে। যে শাস্ত্রের আলোচনায়

আমরা এই মহাসত্যের সন্ধান লাভ করিতে পারি, তাহাকে উপহাসে উড়াইয়া দিলে, আমাদের জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য প্রশংসালাভ করিতে পারে না।

এখন কেবল যথারীতি অনুসন্ধানকার্য্য আবদ্ধ হইবার সূত্রপাত হইয়াছে; এখনও অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য দেশের লোককে পাথর কুড়াইতে হইবে। ইহার জন্য শ্রম স্বীকার করিতে হইবে, অর্থব্যয় করিতে হইবে, উপযুক্ত অনুসন্ধান-পদ্ধতির ও বিচার-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বিদেশের লেখকগণের উপর এই ভার ন্যস্ত করিয়া বসিয়া থাকিলে, সকল সময়ে সকল বিষয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হইবার আশা করা যাইতে পারে না। তাঁহারা পথপ্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন; আমরা গৃহকোটরে আবদ্ধ থাকিয়া, অনুসন্ধান-কার্য্যকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে কাহার ক্ষতি;—তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশেও, ভারতশিল্পের অল্পাবিস্তর আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। এই আলোচনা প্রকৃতপথে যথাযোগ্যভাবে পরিচালিত হইলে, ভারতশিল্পের মূল প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তাহা যে কেবল সভ্যসমাজের সম্মুখে এক নূতন শিল্প-জগতের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়াই নিরস্ত হইবে তাহা নয়। তাহাতেই আমরা আমাদিগকে চিনিয়া লইতে পারিব;—সে কালের সহিত এ কালের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের পরিচয় লাভ করিয়া, আমাদের প্রকৃত মর্য্যাদা অনুভব করিতে পারিব।

এই অনুসন্ধান-কার্য্য যত অধিকদূর অগ্রসর হইবে, ততই ভারত-শিল্পের নূতন নূতন কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। কুমার শরৎকুমার রায় বাহাদুরের অকাতর অর্থব্যয়ে, এবং অপরাজিত অধ্যবসায়ে, বাঙ্গালীর শিল্প প্রতিভার যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইতেছে তাহা এখনও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-সমাজের সম্মুখে যথাযোগ্যভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। তাহাতেও এক নূতন শিল্প-জগৎ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িতেছে।

তাহা বাঙ্গালীর শিল্প-জগৎ ;—বাঙ্গালীর ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য গৌরব-ক্ষেত্র। সে জগতের শিল্প-সম্রাট বরেন্দ্রভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বেও, তাঁহার নাম অপরিজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি তাঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে।

সূত্র-পরিচিত

১. Handbook of Sculpture. Edinburgh, 1864.

২. Sculpture and painting are unknown as fine arts in India.— *Industriel Arts of India.*

৩. Royal Society of Arts.

৪. সার জর্জ এই সূত্রীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এত দূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, যবদ্বীপের প্রস্তরমূর্ত্তিকে brazen image বলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

৫. A History of Fine Art in India and Ceylon, from the earliest times to the present day. Oxford, Clarendon Press.

৬. ভাষতে অনয়া (পরিপাট্যা) লোক ইতি।

৭. ভিন্সেন্ট স্মিথ ইহার পরিচয় দিবার জন্য লিখিয়াছেন,—Notwithstanding the endless diversity of races, creeds, customs and languages, India as a whole has a character of her own which is reflected in her art."

৮. The Ideals of the East.

ভারতশিল্পের বর্ণপরিচয়

ভারতশিল্পের "বর্ণপরিচয়" হারাইয়া গিয়াছে। যাহা আছে, তাহা "চারুপাঠ";—সুন্দর, কিন্তু অনির্ব্বচনীয়ের আধার। ইতিহাস না থাকায়, তাহার ক্রম-বিকাশের পরিচয়লাভের উপায় নাই। যাহা আছে, তাহা কাহার পরিণতি? তাহার রহস্যভেদ করা অসম্ভব। তথাপি ভারত-শিল্পের সৌন্দর্য্যমোহ ধীরে ধীরে সভ্যসমাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতেছে। যাহারা এক সময়ে কেবল উপহাস করিত তাহারাও উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

"সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্য।"

বন্ধু বলিলেন,—"সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্য।"

"যাহারা সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপাসক, তাহারা ইতিহাস ধরিয়া, সন তারিখ গণিয়া, সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ করিবার জন্য অপেক্ষা করে না। আকাশ কত সুন্দর। মেঘমুক্ত সুনীল গগনের পূর্ণচন্দ্র কত সুন্দর। প্রভাত-শিশিরের মুক্তাধারা-বিধৌত দূর্ব্বাদল কত সুন্দর। জগতে যাহা কিছু সুন্দর, তাহার একটিরও ক্রম-বিকাশের ইতিহাস জানি না। জানি না বলিয়া, সৌন্দর্য্য-সম্ভোগের বাধা হয় কি? ভারতশিল্পের পক্ষে বাধা হইবে কেন?"

বন্ধু যখন এই সকল তর্ক তুলিয়া ব্যতিব্যস্ত করেন, তখন তাঁহাকে বুঝাইবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আহা! আহা! মরি! মরি! করা সহজ। কিন্তু তাহা অনেক স্থলেই অজ্ঞতার নামান্তর মাত্র,—না বুঝিয়া বুঝিবার ভাণ করা. সেরূপ সমালোচনা সমালোচককে বা সমালোচ্য বস্তুকে—কাহাকেও প্রকৃত গৌরব দান করিতে পারে না। সহজ বলিয়াই সর্ব্বত্র তাহার এত ছড়াছড়ি। বন্ধু তাহা

স্বীকার করেন না।

প্রকৃতির মধ্যে হয়ত কোন কিছুই অসুন্দর নাই। পদবিদলিত বালুকাকণা, তাহাও হয়ত কত সুন্দর। কিন্তু কখন? আমরা যখন চির সুন্দরকে দেখিতে পারি,—

"তখনই ভুবন হয় সুধাময়।"

তাহার পূর্ব্বে,—সুন্দর এবং কুৎসিৎ নামক দুইটি পদার্থের প্রতীয়মান চির-পার্থক্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় না, কাণা ছেলেকে "পদ্মলোচন" বলিয়া আলিঙ্গন করিবার মতো উদারতা জন্মগ্রহণ করে না।

আমরা যখন মানব-শিল্পের অন্তরালে মানবহৃদয়কে দেখিতে শিখিব,—সে হৃদয়ের অন্তস্তল-নিহিত চিরতৃষাতুর সৌন্দর্য্য-পিপাসার পরিচয় লাভ করিতে পারিব,—তখন হয়তো সকল শিল্পের পরিস্ফুট-অপরিস্ফুট সকল নিদর্শনকেই এক অখণ্ড সৌন্দর্য্যের অশ্রান্ত আত্মবিকাশ-চেষ্টা বলিয়া, তাহার মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। তখন হয়ত আহা! আহা! মরি! মরির মধ্যেই সকল সমালোচনা ডুবিয়া পড়িতে পারিবে।

"কিন্তু তাহার পূর্ব্বে?"

সকল শিল্পেই দুইটি সৌন্দর্য্য,—দুই শ্রেণীর দুই প্রকারের ব্যক্তাব্যক্তের অভিব্যক্তি। একটি যে কেহ দেখে,—যে কেহ দেখিতে পারে,—যে কেহ অনুভব করিয়া অনুভূতি ফুরাইয়া ফেলিতে পারে। আর একটি দেখিতে হইলে, তত সহজে দেখার কাজ শেষ হইতে পারে না। যে যুগের শিল্প, সেই যুগের মানুষকে জানিতে হয়,—তাহার ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কিরূপ ছিল, তাহারও পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। কারণ, সকল শিল্পই মানুষের আত্মবিকাশচেষ্টার অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাহার মধ্যে "ব্যক্ত" অপেক্ষা "অব্যক্ত" সৌন্দর্য্যই অধিক। সে সৌন্দর্য অনুভব করিতে না পারিলে, সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ লালসা সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয় না। আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়,—অতৃপ্তি থাকিয়া যায়,—যে যবনিকা অপসারিত হইবার নয়, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া

আসিতে হয়। ইতিহাসের অভাব প্রকৃত অভাব বলিয়াই অনুভূত হয়। যাহারা 'পীরামিড' রচনা করিয়াছিল, তাহাদের যে যৎসামান্য পরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেই তাহাদের রচনাগুলি কত না গৌরব লাভ করিয়াছে। তাহা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে, 'পীরামিড' সুন্দর ছিল, বৃহৎ ছিল,—সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে পৃথিবীর আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়াও পরিচিত ছিল। কিন্তু তখন তাহার পাথরগুলো কথা কহিত না,—পাথরের ভিতর হইতে মানবহৃদয়ের কোমলতার কমনীয় স্পর্শসুখ জাগাইয়া তুলিতে পারিত না। তখন তাহা বিস্ময়ের বিষয় ছিল,—এখন তাহা প্রীতিবিমণ্ডিত পবিত্রতার আধার।

খণ্ডাচলে যাও। দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্বকালের মানুষের পরিচয় না জানা থাকিলে, গুহাগুলির সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিবে। গুহার মধ্যে এখনও সেকালের মানব-হৃদয়ের তপ্তশ্বাস অনুভব করিতে পারিবে। বুঝিতে পারিবে,—তাহারা মরে নাই। যাহারা এমন গুহা রচনা করিয়াছিল, তাহারা মরিতে পারে না, তাহারা শিল্পের মধ্যে চিরজীবি হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের আশা,—তাহাদের আকাঙ্ক্ষাই,—গুহারূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের সভ্যতার মূলসূত্র প্রত্যেক রেখাপাতে চিরাঙ্কিত হইয়া মানব-সভ্যতার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। যাহা আছে, তাহার মধ্যেই, যাহা নাই, যাহা ছিল, তাহার অব্যক্ত সৌন্দর্য্য পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাস ভিন্ন, কে তাহার রহস্যভেদ করিবে ?

এবার আমরা যখন খণ্ডাচলে, তখন একটা বাঘ বড় উপদ্রব করিয়াছিল। সে গুহার মধ্যে রজনী যাপন করিয়া, গুহাটিকে দুর্গন্ধময় করিয়াছিল। এক রাত্রির গুহাবাসের আরামটুকু উপভোগ করিয়া, প্রভাতে আমাদের বিজয় বাহিনীর সমাগম-শঙ্কায়, অপরাধীর মতন পলায়ন করিয়া, লতাগুল্মে আত্মগোপন করিতেছিল। বাঘ শিল্প সৌন্দর্য্য উপভোগ করে নাই,—আরামটুকুই উপভোগ করিয়াছিল। আমরাও অনেক সময়ে তাহার অধিক কিছুই করি না। শিল্প সৌন্দর্য্যের আরামটুকু উপভোগ করিতে বেশী

কিছু জানাশুনার দরকার হয় না।

যাহারা পাহাড় কাটিয়া, এই সকল গুহা রচনা করিয়াছিল, তাহারা শিল্প সৌন্দর্য্যের নিদর্শন রাখিয়া যাইবে বলিয়া রচনা-শ্রম স্বীকার করে নাই। তাহারা আপন প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে যাহা করিয়াছিল, তাহার ফল সুন্দর হইয়া রহিয়াছে। দীর্ঘকালের অধ্যবসায়-বলে এক একটি গুহার রচনাকার্য্য শেষ হইলে, যে আত্মপ্রসাদ উপচিত হইয়াছিল, তাহা যেন এখনও গুহাতলে যোগাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে!

ইহা না জানিয়া, যাহারা উদ্ধত মস্তকে গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া, কৃপা-কটাক্ষে অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তাহারাই নাসিকা-কুঞ্চিত করিয়া, লিখিয়া গিয়াছে,—"কি ছোট্ট কামরা গা,—ইহার মধ্যে কেমন করিয়া 'মানুষ' বাস করিত?" ইহার মধ্যে সম্ভোগ লালসাপূর্ণ ঔদ্ধত্য বাস করিত না,—সে কথাটা জানাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে। তাহার অভাবে, ইহার সৌন্দর্য্য অনেকটা খাটো হইয়া পড়ে। ইতিহাস ভিন্ন, কে তাহা জানাইয়া দিবে?

যাহার নাম "রাণী-গুম্ফা" তাহা একটি অবরোধশূন্য অন্তঃপুর। মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ। তাহার তিন দিকে দ্বিতল গুহাপ্রকোষ্ঠাবলী। তাহা এমন সুকৌশলে পূর্ব্বাস্যে সংস্থাপিত,—প্রভাত হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত, আলো ও ছায়া পর্যায়ক্রমে তাহার শিল্প-শোভাকে কত নূতন নূতন সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যে বিমণ্ডিত করিয়া, তাহাকে চিরপরিবর্ত্তনশীল মেঘমালার অনির্ব্বচনীয় শোভার ন্যায় অসীমত্ব দান করিয়াছে! যদি দেখিতে চাও,—প্রভাত হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত নির্ণিমেষ-নয়নে চাহিয়া দেখ,—কেমন আলোক-সামান্য অসীম সৌন্দর্য্যসাগরের অনিন্দ সুন্দর চিত্রপট। যাহারা ইহা রচনা করিয়াছিল, তাহাদের হাতে গুহার আয়তন সীমাবদ্ধ হইলেও, রচনা-কৌশল সীমাশূন্য উদারহৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়া মানবমন সসীম হইতে অসীমে আকর্ষণ করিতেছে।

যাহারা গুহা রচনা করিয়াছিল, তাহাদের বাহুবল ছিল,—শাসন-

কৌশল ছিল,—ঐশ্চর্য্যবলেরও অভাব ছিল না। পাষাণে গঠিত দ্বারপাল-গণের অস্ত্রে শস্ত্রে বসনে ভূষণে, তাহাদের গতিহীন স্থিতিভঙ্গীতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বারের উপরে যে কারুকার্য্য এখন নীরবে মলিনমুখে কালের করাল কবলের অনিবার্য্য ধ্বংসলীলার পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহাতেও জয়-পরাজয়ের চির পুরাতন শক্তি-সামর্থ দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

তথাপি গুহাগুলির ভাব কেমন স্বতন্ত্র,—কেমন আত্মনিষ্ঠ,—কেমন প্রগল্ভতাশূন্য,—শান্তিশোভার আধার! সকল গৌরবের উপর আত্মজয়ের গৌরব বড় বলিয়া পরিচিত ছিল বলিয়াই, রচনা-লালিত্যে এমন কমনীয়,—শৌর্য্যবীর্য্য-ঐশর্য্য-মুখরতা এমন সুসংহত। সে কালের মানব-সমাজের ঐতিহাসিক সমাচার জ্ঞাত হইয়া, তাহাদের পাদপদ্মপূত পার্ব্বত্যপথে এই সকল গুহাদ্বারে উপনীত হইবামাত্র, আপনা হইতেই বলিতে ইচ্ছা হয়, —

"নমো অরিহন্তাণম্। নমো সব সিধানম্।"

অর্হৎগণকে নমস্কার। সকল সিদ্ধ পুরুষকে নমস্কার। তোমরা যুগে যুগে মানবসমাজের নমস্কার গ্রহণ কর। সর্ব্বসত্ত্বরাশির [সকল জীবজগতের] অনুত্তর [শ্রেষ্ঠ] জ্ঞান প্রাপ্তি হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ কর,—ধরাধাম হইতে সকল ক্ষুদ্রতা দূরীভূত হউক।

প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা।
পুংসাং যেনোপদিশ্যতে তচ্ছাস্ত্রমিতি কথ্যতে॥

সুনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র-শাসনই ভারত-সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান বিশিষ্ট লক্ষণ। ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহাই প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিচয়। সেই চিরপুরাতন শাস্ত্র-শাসনের "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" ঘটাইয়া, অধুনা যে সকল নববিধান প্রচলনের চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার মূলে পুরাতনের উপর অপরিস্ফুট অনাস্থা। ইহা ভারতবাসীর বংশপরম্পরাগত নহে; পর-প্রভাবপ্রসূত এক আগন্তুক উম্মাদনা;—স্বদেশী নহে; বিদেশী।

তাহার উত্তেজনায় কেহ সংহারকে "সংস্কার" নাম দিয়া, স্বেচ্ছাচারের পক্ষসমর্থনে বদ্ধপরিকর; কেহবা, পরোক্ষভাবে তুল্য ফল লাভ করিবার আশায়, শাস্ত্রবচনের নানা মনঃকল্পিত ব্যাখ্যায় নবসংহিতা রচনায় অগ্রসর। এই পদ্ধতি প্রথমে সমাজ-সংস্কারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; এখন ইহা নানা বিষয়ে অল্পাধিক অনধিকার-প্রবেশ করিয়া, ভারত-চিত্রচর্চ্চার প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যেও অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্র-শাসনের এরূপ অর্ব্বাচীন "অতিক্রম-ব্যতিক্রম"-চেষ্টার আলোচনা আবশ্যক।

যাহারা ভারতশিল্প-পদ্ধতির "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" সংসাধনের জন্য অগ্রসর, তাঁহারা প্রথমে ভারতশিল্পশাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াই বিদেশীর পদ্ধতিতে রচনা-কার্য্যে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতশিল্পকে সেই বিদেশীয় ছাঁচে ঢালাই করিবার জন্য তাঁহারাই অবার কিঞ্চিৎ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া, ভারতশিল্পশাস্ত্রের সুনির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধের মধ্যে তাঁহাদিগের নববিধান-সমর্থক রচনাবলীর আবিস্কার-কামনায় অনুসন্ধানকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ভারত-শিল্পপদ্ধতি এইরূপে আপন বিশিষ্ট লক্ষণ হারাইবার পথে সবলে আকর্ষিত হইলেও, আকর্ষণ-

কারিগণ পূর্ব্বতন নাম-গৌরব পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইতেছেন না। কারণ, এই অর্ব্বাচীন নববিধানকে ভারতশিল্পের পুরাতন নামে চালাইয়া লইতে পারিলে, পুরাতন কৌলিন্যের খাতিরে ইহা কাহারও না কাহারও কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে পারিবে ; অন্যথা নববিধান হিসাবে সভ্যসমাজের আধুনিক অগণ্য শিল্পবিধানের মধ্যে ইহাকে নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য নিম্নস্তরেই মুখ-গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে! তজ্জন্য ইহাঁরা পুরাতন নাম পরিত্যাগ করিতে অসম্মত, অথচ পুরাতন পদ্ধতির "অতিক্রম-ব্যতিক্রম"-সাধনের জন্যও লালায়িত। এরূপ আচরণ অপরিহার্য্য। এক পথে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকা অসম্ভব। কারণ, বিশিষ্টতার অভাবই এই নববিধানের বিশিষ্টতা,—তাহার অপর নাম "স্বৈরাচার"। তাহা এখনও স্বাধীনতার এবং স্বেচ্ছাচারের সীমানির্দ্দেশ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

স্বৈরাচারিগণ ভারতশিল্পপদ্ধতি যথাযথরূপে অধিগত করিয়া, রচনা-কার্য্যে সিদ্ধহস্ত হইয়া পুরাতন রচনা-রীতির "অতিক্রম-ব্যতিক্রম"-সাধনের প্রয়োজন বুঝাইয়া দিয়া, নববিধান প্রচলনের চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা সুসংযত সুনির্দ্দিষ্ট সুসংগত "সংস্কার" নামে মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিত। সে পথ অবলম্বন না করায়, যাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, তাহা অ-প্রচ্ছন্ন শাস্ত্র-বিদ্বেষ। তাহাই প্রথম শিক্ষার্থীর সাধারণ লক্ষণ। বিধিনিষেধের অবতারণা করিয়া. শাস্ত্র স্বৈরাচার সুসংযত করে ; এবং তাহাতেই মানব-সভ্যতা বিকাশ-লাভ করে। ব্যকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সময় নষ্ট করিব কেন, এই শাস্ত্র-বিদ্বেষের উত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে কেবল একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—"ম্লেচ্ছ (অসভ্য) হইয়া না পড়ি, ইহার জন্যই ব্যকরণ অধ্যয়ন করিতে হইবে।" সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেই ইহা তুল্যভাবে উল্লিখিত হইতে পারে। এ বিষয়ে কেহ কখনও ভারতবর্ষকে অতিক্রম করিতে পারে নাই ; বরং সমগ্র প্রাচ্য ভূমণ্ডলেই সময়ে সময়ে ইহার অনুকরণ-চেষ্টা প্রচলিত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেও,

অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

শিষ্ট হইতে হইলেই শাসন স্বীকার করিতে হইবে;—তাহারই নাম শাস্ত্র। বিশ্বকর্ম্মা অসাধারণ শিল্প-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি শাস্ত্রশাসন অস্বীকার করিয়া, প্রথমে স্বাধীনভাবে কৃতিত্ব প্রদর্শনের আশায়, আপন পুত্রের একটি দারুমূর্ত্তি রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কোনরূপ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধ স্বীকার না করিয়া, দারুখণ্ড চাঁছিয়া ফেলিতে ফেলিতে যাহা দাঁড়াইল, তাহা মনুষ্যমূর্ত্তি হইল না;—হইল একটি চামচিকা, এই আখ্যায়িকার চামচিকাও একটি "সৃষ্টি"; কিন্তু তাহা শিল্প-সাফল্যের দৃষ্টান্তরূপে সমাদর লাভ না করিয়া, উপহাস লাভ করিল! ভারতশিল্পের সুনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধ উপেক্ষা করিয়া, নববিধানমতে যাহা "সৃষ্ট" হইতেছে, সে "সৃষ্টিও" সকলের "দৃষ্টিতে" তৃপ্তি সঞ্চারিত করিতে পারিতেছে না; অনেকে রাজসভায় দণ্ডায়মান হইয়া, প্রকাশ্যভাবেও তাহাকে উপহাস করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। প্রত্যুত্তরে স্বৈরাচারিগণ পুরাতন শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে অনুকুল প্রমাণের আবিষ্কার ঘোষণা করিয়া তাহার ব্যাখ্যাকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাহা কতদূর শাস্ত্রসংগত, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

পূর্বপরিচয়শূন্য অসম্পূর্ণ অভিনব শিল্প-পদ্ধতি, কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে পারিলে, অবশ্যই সমাদর লাভের অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বনাম রক্ষা করিয়া, পূর্ব্বরীতির "অতিক্রম-ব্যতিক্রম"-সাধন করিতে চাহিলে, কৈফিয়ৎ দিতেই হইবে। নচেৎ, তাহাতে কোনরূপ কৃতিত্বের আভাস ফুটিয়া উঠিলেও, স্থিতিশীল জনসমাজ সহসা তাহাকে পুরাতনের মর্যাদা দান করিতে সম্মত হইবে না। যাহা গিয়াছে, তাহা শাস্ত্রাধীন ছিল। আঁকিতে আঁকিতে যাহা দাঁড়ায় দাঁড়াইয়া যাউক, তাহার পর দেখিয়া শুনিয়া, পরামর্শ করিয়া, একটা যাহা কিছু নামকরণ করিয়া লওয়া যাইবে,—পুরাতনের মধ্যে এরূপ অনিশ্চিত নিরুদ্দেশ—যাত্রা প্রচলিত ছিল না। এই ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করিয়া, অধুনা কেহ

কেহ বলিতে চাহিতেছেন—সেকালের শাস্ত্রেও ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগাই রমণীয়ত্বের মাপকাঠিরূপে স্বীকৃত ও অবলম্বিত হইয়াছিল। ইহার একটি প্রমাণ ও উল্লিখিত এবং ব্যাখ্যাত হইতেছে।

প্রমাণ :—

"লগ্নং যত্র চ যস্য হৃৎ।"

অস্যার্থ :—

যস্য (যাহার) যত্র (যাহাতে) হৃৎ (হৃদয়) লগ্নং (লাগে)

ব্যাখ্যা :—

সকল দেশেই শিল্প সম্বন্ধে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে। তাহাতে কোনরূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে,—শিল্পকে "রম্য" (রমণীয়) হইতে হইবে। কাহাকে "রম্য" বলিয়া স্বীকার করিব? যাহা যাহার নিকট রমণীয় বলিয়া অনুভূত হয়, তাহার পক্ষে তাহাই রমণীয়। উদ্ধৃত রচনাংশের ইহাই নির্গলিতার্থ। কিন্তু ইহাই শাস্ত্রার্থ হইলে, শাস্ত্রের প্রয়োজন নিরস্ত হইয়া যায়। ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগাই শাস্ত্রের স্থান অধিকার করে। তাহাকে কোনরূপ নিয়মের অধীন করিয়া, শাস্ত্র-মর্যাদা দান করিবার সম্ভাবনা থাকে না।

এই রচনাংশ কোন শাস্ত্রের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, শিল্প-সাধকগণ তাহার উল্লেখ না করায়, ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে। সমগ্র রচনাটি কি, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, উদ্ধৃত অংশটির কিরূপ ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য; তৎসম্বন্ধে কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে হইলে, তথ্যানুসন্ধান অপরিহার্য্য। তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে,—ইহা "শুক্রনীতিসারের" চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ প্রকরণের একটি বচনের একাংশ; এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরস্পরের পরিমাণ কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তদ্বিষয়ক বিধিনিষেধের অন্তর্গত। সমগ্র রচনাটি এই :-

"শাস্ত্রমানবিহীনং যদরম্যং তদ্বিপশ্চিতাম্।
একেষামেব তদ্রম্যং লগ্নং যত্র চ যস্য হৃৎ ॥"

যৎ (যাহা) শাস্ত্রমান-বিহীনং (শাস্ত্রনির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিমাণহীন) তৎ (তাহা) বিপশ্চিতাং (পণ্ডিতগণের নিকট) অরম্যং (অরমণীয়) একেষামেব (কেবল এক দলের নিকটেই) তৎ (তাহা) রম্যং (রমণীয়) যত্র (যেখানে) যস্য (যাহার) হৃৎ (হৃদয়) লগ্নং (লাগে, আসক্ত হয়, আনন্দ লাভ করে)।

ব্যাখ্যা :—

রম্য কি ? অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেরূপ পরিমাণ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট, তাহাই রম্য ; অথবা তাহার "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" রম্য ? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন,—যাহার পক্ষে রম্য, তাহার উপরেই উত্তরটি নির্ভর করে। একদিকে "শাস্ত্র-মান", আর একদিকে "লগ্নং যত্র চ যস্য হৃৎ",—ইহার মধ্যে কোনটি রম্য ; তাহা বুঝিতে হইলে, অধিকারী বিচার আবশ্যক। অধিকারী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—বিপশ্চিত (পণ্ডিত), অ-বিপশ্চিত (মূর্খ)। যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহাদের নিকট শাস্ত্র-মানই রম্য ;—যাহারা সেরূপ নহে, সেই একদলের নিকটে তাহাই রম্য, "যাহাতে যাহার হৃদয় আনন্দ লাভ করে।" এখানে "একেষামেব" বলিয়া "বিপশ্চিতাম্"-পদের তুলনা করায়, সমগ্র বচনটি স্বৈরাচারের নিন্দা এবং শাস্ত্র-বিধির প্রশংসাই প্রকাশিত করিতেছে। তাহাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য একাংশ মাত্র উদ্ধৃত করায়, যাহা আপাততঃ অনুকূল প্রমাণরূপে প্রতিভাত হয়, সমগ্র বচনের বিচারে তাহাই প্রতিকূল প্রমাণে পরিণত হইতেছে। শাস্ত্রবচনের আংশিক আলোচনাই এইরূপ বিড়ম্বনার কারণ। "লগ্ন যত্র চ যস্য হৃৎ"—ইহা পণ্ডিত বর্গের সিদ্ধান্ত নহে,—শাস্ত্রসম্মত "বিকল্প মত" বলিয়াও কথিত হইতে পারে না। ইহা কেবল একদলের মত ; সে দল "বিপশ্চিৎ" নহে।

অজ্ঞতা দূর করিয়া, বিজ্ঞতা দান করাই শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে তাহা শাসন নহে ; উপদেশ—প্রবৃত্তির এবং নিবৃত্তির উপদেশ ;—বিধি

এবং নিষেধ। তজ্জন্য শাস্ত্রের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল।[১] তাহার অভাবে, ব্যাকরণ-অভিধানের সাহায্যে পুরাতন টীকাহীন শাস্ত্রবচনের মর্ম্মার্থ আধুনিক টীকাকারগণের চেষ্টায় সকল স্থলে যথাযথরূপে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এখানেও সেইরূপ টীকা-বিভ্রাটই অনর্থ উৎপাদিত করিয়াছে। শাস্ত্র তাহার বক্তব্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে বিধিনিষেধের অবতারণা করিয়াই নিরস্ত হয় নাই; তাহার "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" নিরস্ত করিবার জন্য নানারূপ শাসনবাক্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পরিমাণ-সামঞ্জস্য লঙ্ঘন করিয়া কি কি ইহ-লৌকিক ক্ষতি হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিয়া, ভয় প্রদর্শন করিয়াছে। তাহা সমূলক হউক অমূলক হউক, তাহাই শাস্ত্রের শাসন-ধারাকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল। "লগ্নং যত্র চ যস্য হৃৎ"—এই মত যে শাস্ত্র সংগত নহে, এবং ইহা যে কেবল অ-বিপশ্চিৎগণের মত, তাহা বুঝাইবার জন্যই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাকে শাস্ত্রাভিপ্রেত "বিকল্প-বিধি" বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না।

পুরাতন অশনবসন-ব্যবস্থা আমাদিগকে এখন আর তৃপ্তিদান করিতে পারিতেছে না। পুরাতন শিল্প-ব্যবস্থা যে তৃপ্তিদান করিতে থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং তাহার "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" সাধনের প্রয়াস অনিবার্য্য। তজ্জন্য যাঁহারা বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা "ভারত-শিল্প সমিতি" নাম গ্রহণ না করিয়া, "ভারত শিল্প-সংস্কার সমিতি" নাম গ্রহণ করিলে কাহাকেও কিছু বলিবার থাকিত না। সংস্কার সংহার মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে কি না, ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবার অবসর লাভ করিবে।

ভারত-শিল্প পদ্ধতির নামে শিল্প-সাঙ্কর্য্যের অভ্যুদয় হইতেছে বলিয়া, তাহার কৌলিন্য রক্ষার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহা ইতিহাসে একটি রচনাধারার প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে সহসা বিলুপ্ত হইতে দিলে, ভারতশিল্প পদ্ধতির বিশিষ্টতা বিনষ্ট

হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার পথ বড়ই বন্ধুর,—তাহা খেয়ালসাপেক্ষ নহে, শিক্ষাসাপেক্ষ। তাহার চেষ্টা করিতে হইলে, খেয়ালী-গণকে ছাড়িয়া দিয়া, শিক্ষার্থিগণকে লইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। কারণ, খেয়ালীগণ শিখিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে অসম্মত, শিখাইবার জন্যই অবসর শূন্য। তাঁহারা যে উন্মাদনা লাভ করিয়াছেন তাহার নিদান —"নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।" শিল্পিগণ রচনা করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারাও কবিপদবাচ্য। তজ্জন্য তাঁহারাও নিরঙ্কুশ। কথাটা এখন যেখানে সেখানে প্রচারিত হইতেছে। সুতরাং তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

কবে কোন্ সূত্রে এই কথার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এখন কেবল কথাটা মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই যাহা জানে, কেহই তাহার তাৎপর্য্যের সন্ধান লাভ করিবার জন্য প্রয়োজন স্বীকার করে না। কিন্তু এই নিরঙ্কুশত্বের "ব্যাপ্তি" অর্থাৎ দৌড় কতদূর তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা করিবামাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও বিধি-নিষেধাত্মক সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ,—স্বৈরাচার নহে, শাস্ত্রাচার। ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ,—

"অপি মাষং মষং কুর্য্যাচ্ছন্দোভঙ্গং ন কারয়েৎ।"

ছন্দই কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ; তাহাকে রক্ষা করিয়া রচনা-ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে। যদি ছন্দোভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তখন (তন্নিবার-নার্থ) বিশুদ্ধ "মাষ" শব্দকে অশুদ্ধ "মষ" শব্দরূপেও ব্যবহার করিতে হইবে। ছন্দোভঙ্গের আশঙ্কা না থাকিলে, এই "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" চলিবে না। ইহা কবিকুলের নিরঙ্কুশত্বের একটি উদাহরণ। কোথায় ইহা চলিবে, কোথায় চলিবে না, ইহার মধ্যেই তাহার সীমা সুনির্দ্দিষ্ট।

"ছন্দোবৎ কবয়ঃ কুর্ব্বন্তি।"

ভারতবর্ষে বৈদিক ও লৌকিক নামক দুই শ্রেণীর ভাষা দুই শ্রেণীর ব্যাকরণ-সূত্রের অধীন ছিল। লৌকিক সাহিত্যে কাব্যাদি রচনা করিবার সময়ে লৌকিক ব্যাকরণ সম্মত পদ প্রয়োগ করাই সাধারণ রীতি বলিয়া

পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে লিখিয়া গিয়াছেন,—কবি-কুল সর্ব্বত্র তাহা মানিয়া চলিতেন না,—তাঁহারা ছন্দোবৎ (বৈদিক প্রয়োগবৎ) প্রয়োগের ব্যবহার করিতেন। ইহার আর এক নাম "আর্ষ-প্রয়োগ"—বেদ বিজ্ঞাপক ঋষি শব্দের উত্তর "তত্র ভব" এই অর্থে অন্-প্রত্যয়ে ইহা সিদ্ধ বলিয়া কুল্লুকভট্ট স্বকৃত মনুটীকায় ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার অর্থ "বৈদিক-প্রয়োগ।" এখানেও নিরঙ্কুশত্ব ব্যাকরণ-শৃঙ্খল মুক্ত নহে,—লৌকিক ব্যকরণ সম্মত না হইলেও, বৈদিক ব্যাকরণ সম্মত,—স্বৈরাচার নহে, শাস্ত্রাচার।

অধিক উদাহরণের উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে,—কবি-কুলের কোনও শ্রেণীর নিরঙ্কুশত্বই সীমাশূন্য স্বেচ্ছাচার নহে,—তাহা সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়-বিশেষের সুনির্দ্দিষ্ট অধিকার মাত্র। তাহার দোহাই দিয়া শিল্পিগণকে শিল্পশাস্ত্রের "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" সাধনে নিরঙ্কুশ বলিয়া বর্ণনা করিবার উপায় নাই। শিল্পশাস্ত্রেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

যাহা ভাল লাগে তাহাই ভাল, শিল্পীগণ তজ্জন্য শিল্পশাস্ত্রের "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" সাধনে নিরঙ্কুশ,—এই দুইটি সিদ্ধান্তই ভারতশিল্পের পক্ষে অপ-সিদ্ধান্ত। ভারতশিল্পশাস্ত্র শিল্প-প্রতিভাকে পঙ্গু করিয়া শিল্পের অবনতি সাধন করিয়াছিল কি না, তাহা শিল্পের কথা নহে, ইতিহাসের কথা। সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইবার পূর্ব্বে প্রমাণ আবশ্যক। ভারতশিল্প-পদ্ধতির লক্ষ্য কি, তাহার উৎপত্তির হেতু কি, তাহার পরিণাম কি, এখনও তাহার যথাযোগ্য অলোচনার সূত্রপাত হয় নাই। সুতরাং তাহার "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" সাধনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কি না, তাহা এখনও সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যদি সত্যসত্যই প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে "শিল্প-সংস্কার সমিতি" গঠিত করিতে হইবে, কিন্তু তাহাকে "ভারতশিল্প-সমিতি বলা চলিবে না। ভারতশিল্প-সমিতির নিকট জিজ্ঞাসুগণ দুইটি বিষয় জানিতে চাহেন,—(১) ভারতশিল্পের

বিশিষ্ট লক্ষণ কি, এবং (২) তাহার উদাহরণ কিরূপ? প্রথমটি এখনও অনালোচিত, দ্বিতীয়টি আধুনিক শিল্পচর্চ্চার যেসকল উদাহরণ উপস্থিত করিতেছে, তাহার সবগুলিই কৌলিন্য-হীন সাঙ্কর্য্য-প্রসূত "অতিক্রম-ব্যতিক্রমের" লীলা-পুত্তল। তাহাও এক শ্রেণীর শিল্প, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গে আত্ম-প্রভাব অপেক্ষা পর-প্রভাব অধিক সুব্যক্ত। তাহাকে ঝাড়িয়া, ফেলিয়া, শিল্পে, "স্বরাজ" লাভ করিতে হইলে, শাস্ত্রবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্র-মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য যত্নশীল হইতে হইবে। তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বিদুষী স্তেলা ক্রামরীশ অল্পদিন হইল এই পথে পদার্পণ করিয়া, (বিগত ডিসেম্বর মাসের 'মডার্ন' রিভিউ' পত্রে) ভারত-শিল্পপদ্ধতির মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি উপাদেয় তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বিদেশিনী হইয়াও, ভারত-সভ্যতার মূল্যানুসন্ধানে ব্যাপৃতা এবং ভারতশিল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া লিখিয়াছেন :—

"The evolution of Indian art is organised by the rhythm which organises the work of art, and nothing is left to chance, and little to extraneous influence. * * * Its movements are strictly regulated. In no other civilisation therefore, we find such minute prescriptions for proportions and movements. The relation of the limbs, every bent and every turning of the figures represented, are of the deepest significance. This dogmatism, far from being sterile, conveys regulations how to be artistically tactful, so that no overstrain, no inadequate expression, and no weakness ever will become

apparent. The regulations are a code of manners. * * * Tradition thus is the lifeelixir of the East. It secures steadiness, and keeps the channels smooth where intuition is mouleded into proper form. The quality of Eastern art, therefore, never sinks below a certain level, while utmost concentration and imtensity find their realisation to within those limits without effort and without struggle."

ইহার প্রত্যেক কথাই ধীরভাবে প্রনিধানযোগ্য। "অতিক্রম-ব্যতিক্রম"-স্পৃহা ভারতশিল্পের নাম দিয়া যে সকল সৃষ্টিলীলার পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহার মধ্যে ভারতশিল্পের এই সকল সুপরিচিত বিশিষ্ট লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে না। তাহার সকল উদাহরণেই কিছু না কিছু চেষ্টা-কৃচ্ছ্রতা (over-strain) ;—অস্ফুট বিকাশ (inadequate expression) ;— চিত্রদৌর্ব্বল্য (weakness) দেদীপ্যমান। একটি উদাহরণও এই সকল ত্রুটিশূন্য হইলে, নববিধান সুশোভনরূপে তাহার জয়-ঘোষণা করিতে পারিত। তাহা এখনও জয়লাভ করে নাই ; যাহা পাইয়াছে, তাহা কাহারও কাহারও কৃপা-কটাক্ষ !

ভারত-সভ্যতা কাহারও আকস্মিক সৃষ্টি বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তাহা যুগযুগান্তরের অসংখ্য ঘটনাবলীর সমষ্টিগত অভিব্যক্তি। সেই প্রাচীন সভ্যতার অঙ্গীভূত শিল্পাদির অবস্থাও সেইরূপ। তাহার "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" ভারত-সভ্যতার মূল আদর্শের "অতিক্রম-ব্যতিক্রম"। সুতরাং তাহাতে যে পরিমাণে ভারতীয় ধ্যান ধারণার পরম্পরাগত ঐতিহাসিক ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহাকে ভিন্নপথে পরিচালিত করিতে হইলে, তাহার বিশিষ্ট লক্ষণেরও "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" সংঘটিত হইবে,—তাহা যাহা, তাহা থাকিবে না ; কেবল তাহার নাম থাকিবে "ভারত-শিল্প",—এরূপ পরিণতি সকলের নিকট সমান স্তুতি লাভ করিতে পারে না। "লগ্ন" যাত্র চ

যস্য স্বং”—এই ছিন্ন মূল বচনাংশ ধরিয়া, কেহ যদি আত্মতৃপ্তি সাধনের জন্য “অতিক্রম-ব্যতিক্রম”—সাধনের আয়োজন করেন, তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু তাহাকে পুরাতন শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা চিত্রবিদের অধিকার অতিক্রম করিয়া, শাস্ত্রবিদের অধিকারে অনধিকার-প্রবেশ করে,—ইতিহাসের সহিত শিল্পের সামঞ্জস্য আঘাত প্রাপ্ত হয়। গান্ধার-পদ্ধতি উত্তর পশ্চিম প্রান্তের ভারত-সীমান্তে কোটরাবদ্ধ থাকিয়া অল্পকালেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল,—মোগল-রাজপুত-পদ্ধতি রাজসভার উন্নতি-অবনতির সহযাত্রী হইয়া, দরবারী পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছিল ;—এই সকল আগন্তুক পদ্ধতি ভারত-শিল্পপদ্ধতির মূলপ্রস্রবণকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। আধুনিক শিল্পসাধকগণ সংযমশূন্য নিরঙ্কুশত্বের দাবী দরপেশ করিয়া, শিল্পসাধনা করিতে থাকিলে, তাহার পরিণাম কিরূপ হইবে? অল্পদিনের মধ্যে যতগুলি অ-ভারতীয় রীতি প্রশ্রয়লাভ করিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেই, প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে।

সূত্র-পরিচিতি

১. এই প্রবন্ধের শিরোভাগে যে ভট্টোক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে শাস্ত্র কাহাকে কহে তাহা সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

ভারতশিল্প তত্ত্ব

শিল্প কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে মতভেদের অভাব নাই। তজ্জন্য, অতিঅল্প দিন পূর্ব্বেও, পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রাচ্য-শিল্পের কোনও নিদর্শনই প্রকৃত শিল্প-নিদর্শন বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিত না। তাঁহারা পাশ্চাত্যভূমণ্ডলকেই শিল্পের একমাত্র লীলাভূমি বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন।

সে সঙ্কীর্ণ ধারণা ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ;—এখন প্রাচ্য-শিল্পও এক শ্রেণীর শিল্প বলিয়াই সমাদর লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মানবশিল্পের মূল প্রকৃতি যতই আলোচিত হইতেছে ; পাশ্চাত্য পূর্ব্বসংস্কার ততই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। এমনকি সৌন্দর্য্যবিকাশ-লালসায় শিল্পের মধ্যে মানবপ্রকৃতির যেরূপ একপ্রাণতা দেদীপ্যমান, তাহা ধরিয়া, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের রাগানুরাগ মিলন-ভূমির তথ্যানুসন্ধানেরও সূত্রপাত হইতেছে।

শিল্প-যাহাই হউক, তাহা মানব-চিত্ত-বৃত্তির ভাব-সম্পদের বাহ্য-বিকাশ ;—মানব-প্রতিভাপ্রসূত এক অলৌকিক সৃষ্টি-কৌশল। ভারত-বর্ষের পুরাতন সাহিত্য শিল্প-শব্দের ব্যুৎপত্তি যেভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ইহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"শিল্পং কৌশলং শীল: সমাধৌ।"

"শীল সমাধৌ"—(উণাদি-সূত্রানুসারে ত-প্রত্যয়ে) নিপাতনে শিল্পশব্দ সম্পাদিত হইয়াছিল। তাহাতে সমাধির,—চিত্তবৃত্তির একাগ্রতার, উল্লেখ করিয়া, শিল্পকে একাগ্রতাসমুদ্ভাবিত কৌশলোৎপন্ন বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। এই ব্যুৎপত্তি স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে,—সকল শিল্পই কৌশলোৎপন্ন,—সে কৌশল মানব-চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা সমুদ্ভাবিত। তাহা অনুকৃতি নহে—সৃষ্টি।

সকল শিল্পের উৎপত্তি-রহস্য এক, কিন্তু সকল শিল্পই একরূপ নহে,—লক্ষ্যের তারতম্যে দুই ভাগে বিভক্ত। যাহার মুখ্যলক্ষ্য যেন তেন প্রকারেণ অভীষ্ট-সাধন, তাহা এক শ্রেণীর শিল্প। যাহার মুখ্য লক্ষ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, তাহা আর এক শ্রেণীর শিল্প। যাহার মুখ্য লক্ষ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, তাহা অধিক প্রতিভা ব্যঞ্জক বলিয়া, অধিক সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। তাহা যে পরিমাণে চিরসুন্দরের অসীম সৌন্দর্য্যের আভাস প্রদান করে, সেই পরিমাণে অনির্ব্বচনীয় ;— সেই পরিমাণে সকল দেশে, সকল যুগে, সকল মানবের নিকট, সমাদর লাভের অধিকারী। পাশ্চাত্য-সাহিত্যে এই শ্রেণীর শিল্প "সুকুমার শিল্প" নামে অভিহিত। কাহারও কাহারও মতে ইহাই কেবল শিল্পপদবাচ্য ; এতদ্দিরিক্ত শিল্প শিল্প নহে ;—পণ্যদ্রব্য। যতই বিস্ময়োৎপাদক হউক না কেন, তাহা কেবল কল্পনা-কৌতুক ;— যতই মূল্যবান্ হইক না কেন, তাহা কেবল মানব-প্রতিভার অকিঞ্চিৎকর রচনা-বিলাস !

শিল্প স্রষ্টার সাধারণ নাম শিল্পী। কিন্তু শিল্প যেমন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত শিল্পীও সেইরূপ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাচীন ভারতে দুই শ্রেণীর শিল্পী দুই প্রকার সামাজিক অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। একশ্রেণী 'কারু' বা "কারুক" নামে,—আর এক শ্রেণী "শিল্পী" নামে অভিহত হইত। "কারুকের" তুলনায় শিল্পী অধিক মর্য্যাদা লাভ করিত। একালের "কারিকর"-শব্দ সেকালের "কারুক"-শব্দের অপভ্রংশ। "কারুক" বা "কারিকর" শ্রমজীবী মাত্র ;— উদ্ভাবক নহে। সে কেবল অপরের উদ্ভাবিত কৌশল-শিক্ষায় এবং দ্রব্যনির্ম্মাণে সিদ্ধ হস্ত। "কারুকের" এবং "শিল্পীর" মধ্যে এইরূপ পার্থক্য থাকায়, স্মৃতিশাস্ত্রে উভয়ের নামই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

"যন্ত্রাকরে কারুক-শিল্পহস্তে।"

বিষ্ণুসংহিতার এই বচনাংশের "কারুক" এবং শিল্পী" সেই পার্থক্য সূচিত করিতেছে। আপদ্ধর্ম্মকালে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ব্যক্তির পক্ষে

জীবনোপায় নির্দ্দেশ করিবার সময়ে, মনুসংহিতায় (১০।১১৬) "শিল্প" একটি উপায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

"বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং বিপণিঃ কৃষিঃ।
ধৃতির্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবন হেতবঃ॥"

এই বচনোক্ত "শিল্প" কারু নহে, ইহা ইঙ্গিতমাত্রে ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায় ইহার ব্যাখ্যায়, কুল্লুকভট্ট লিখন প্রভৃতি কর্ম্মকেই "শিল্প" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখানে "প্রভৃতি"—শব্দ তুল্যশ্রেণীর কর্ম্ম সূচিত করিয়া বলিতেছে,—আপদ্ধর্ম্মকালে যাহা দ্বিজাতির অবলম্বনীয়, তাহা কারুশিল্প নহে, কলা-শিল্প। অমরকোষের টীকাকার ভানুজীদীক্ষিত একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া, দেখাইয়া গিয়াছেন,— যাহারা "কারু" নামে পরিচিত, তাহাদের মধ্যে পাঁচটি জাতির লোক "শিল্পী" বলিয়াও কথিত। যথা,—

"তক্ষা চ তন্তুবায়শ্চ নাপিত রজকস্তথা।
পঞ্চমশ্চকারশ্চ কারবঃ শিল্পিনো মতাঃ॥"

এই বচনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—সকল "কারু" সেকালে "শিল্পী" নামে পরিচিত ছিল, এই বচনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—সকল "সকল" সেকালে "শিল্পী"-নামেও কথিত হইত। এই পাঁচটি জাতির লোক কেবল শ্রমজীবী ছিল না ; স্ব স্ব শিল্পকর্ম্মে উদ্ভাবন প্রতিভারও পরিচয় দান করিত। তজ্জন্য ইহারা গৌরবসম্পদ "শিল্পী" নামও প্রাপ্ত হইয়াছিল। জাতিভেদ সে প্রতিভার অনাদরের কারণ হইত না, ইহাতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোষশাস্ত্রে এই সূক্ষ্ম পার্থক্য উল্লিখিত হয় নাই। তাহাতে "শিল্পং কলাদিকং কর্ম্ম" বলিয়া সাধারণভাবে শিল্পশব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং অমরসিংহ কারু এবং শিল্পীকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্র কারুশব্দে শিল্প ও শিল্পিকে তুল্যভাবে সূচিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল স্থলে শিল্পশব্দ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল শিল্প-

দ্রব্যই সাধারণভাবে শিল্প নামে কথিত হইতে পারে। কিন্তু মর্য্যাদার তারতম্যে একশ্রেণী কারুশিল্প, আর এক শ্রেণী কলাশিল্প। স্মৃতিশাস্ত্রে সেই পার্থক্য সূচিত হইয়াছে।

শুক্রনীতিসারে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে প্রাসাদ প্রতিমার নির্ম্মাণ পদ্ধতির শাস্ত্রকে "শিল্পশাস্ত্র" এবং কাচাদির নির্ম্মাণ-পদ্ধতির শাস্ত্রকে কলাশাস্ত্র বলা হইয়াছে। ইহাতে কৌশল-বিকাশ কলানামে, এবং সৌন্দর্য্যবিকাশ শিল্পনামে অভিহিত হইয়াছে। ভারত-নাট্যশাস্ত্রেও এইরূপ পার্থক্য সূচনার্থ ভক্ত হইয়াছে,—"এমন কলা নাই, এমন শিল্প নাই, যাহা নাট্যে প্রকাশিত হয় না।" যথা,—

"ন সা কলা ন তচ্ছিল্পং যন্নাট্যে ন প্রকাশিতম্।"

প্রধান প্রধান বিদ্যার সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ। এবং কলার সংখ্যা চতুঃষষ্টি বলিয়া শুক্রনীতিসারে উল্লিখিত আছে। তাহাতে বিদ্যার এবং কলার পার্থক্য সূচনার্থ লিখিত হইয়াছে যে,—যাহা কেবল বাগ্‌ব্যাপারসাধ্য তাহাই "বিদ্যা" ; যাহা মূর্খব্যক্তিও সম্পাদন করিতে পারে, তাহাই "কলা"। যথা,—

"যৎ যৎ স্যাৎ বাচিকং সম্যক্ কর্ম্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞিতং।
শক্তো মূর্খোঽপি যৎ কর্ত্তুং কলাসংজ্ঞন্তু তৎস্মৃতম্॥"

এই লক্ষণানুসারে সংগীত একটি "বিদ্যা" ;—বাদ্য "বিদ্যা" নহে, "কলা"। সুতরাং "কলা" কেবল কৌশল ; "শিল্প" তাহা হইতে পৃথক্ ;—তাহা কৌশল নহে "বিদ্যা"। এরূপ শ্রেণীর বিভাগ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। বামন-কৃত "কাব্যালঙ্কার-সূত্র বৃত্তিতে" গীত-কলা নামে উল্লিখিত থাকায়, "কাব্যালঙ্কার কামধেনু" টীকা রচনা করিয়া-ছিলেন। তাহাতে নৃত্যগীতাদি কলা নামে উল্লিখিত এবং কলার সংখ্যা চতুঃষষ্টি, উপকলার সংখ্যা চারি শত বলিয়া উল্লিখিত। তিনি ভামহের গ্রন্থ হইতে চতুঃষষ্টি কলার যে নামাবলী উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বাৎস্যায়নের কামসূত্রোক্ত অথবা শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীকায়

(১০।৪৫।৩৫) উদ্ধৃত নামাবলীর সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীধর স্বামী যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাকে "শৈবতন্ত্রোক্ত" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ যাহাকে অবজ্ঞাবশতঃ কৌশলোৎপন্ন "পণ্য" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, যাহাকে "কারু-শিল্প", এবং "সুকুমার-শিল্প" নামে যাহার সমাদর করিয়া থাকেন, তাহাকে "চারুশিল্প" নামে নামকরণ করিয়া লইলে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শিল্প বিভাগ কল্পনা বুঝিবার এবং বুঝাইবার সুবিধা হইতে পারে।

কারু-শিল্পই হউক, আর চারু-শিল্পই হউক, সভ্যতার ইতিহাসের নিকট উভয়েই তুল্য সমাদর লাভ করিবার যোগ্য। যে জাতির সৌন্দর্য্য-বোধ যে পরিমাণে বিকাশ লাভ করে, সেই জাতি সেই পরিমাণে জীবন-যাপনের উপকরণ গুলিকেও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে ;—কেবল যেন তেন প্রকারেণ কার্য্য সাধন করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। এই কারণে, পুরাতন মৃদ্ভাণ্ডটি পর্য্যন্ত,—পুরাতন মানব-সভ্যতার দ্যোতক বলিয়া,—ইতিহাস লেখকের নিকট অশ্রদ্ধেয় হয় না। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাহার স্থান আছে বলিয়া, তাহার ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত প্রাচীন-শিল্পনিদর্শনের সংগ্রহালয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সকল দেশে, সকল যুগে, সকল মানবের নিকটেই, শিল্পের লক্ষ্য এক ;—তাহা সৌন্দর্য্য-বিকাশ চেষ্টা। কিন্তু সৌন্দর্য্যানুভূতির তারতম্যে,—সৌন্দর্য্যবিকাশক শিল্প প্রতিভার তারতম্যে,—রচনা-সহায়ক উপাদান বস্তুর তারতম্যে,—শিল্প সুষমার তারতম্য সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রতিভার তারতম্যে যুগভেদে এবং স্থানভেদে একই দেশে বিবিধ রচনা রীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যুগভেদে, দেশভেদে, অথবা উদ্ভাবয়িতাভেদে শিল্প নানা নামে পরিচিত হয়।

মূল লক্ষ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও,

সৌন্দার্য্যানুভূতির তারতম্যে পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে। প্রাচ্য যেখানে সৌন্দর্য্যকে আকার দানের চেষ্টা করিয়াছে, প্রতীচ্য সেখানে আকারকেই সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। ইহা হইতে দুইটি পৃথক্ শিল্পাদর্শ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে ;—একটি ভাব সর্ব্বস্ব, অপরটি আকার-সর্ব্বস্ব। একটিতে নর নর নহে, দেবতা ;—অপরটিতে দেবতা দেবতা নহে, নর।

চারু-শিল্পের ন্যায় কারু-শিল্পেও এইরূপ মজ্জাগত পার্থক্য দেদীপ্যমান। তাহাও যুগভেদে, দেশভেদে, এবং দেশ কাল-পাত্রের রুচিভেদে, বিবিধ রচনা-রীতির পরিচয় প্রদান করে। চারু-শিল্পই হউক, কিম্বা কারু-শিল্পই হউক, সকল শিল্পই, তাহার উদ্ভব-স্থানের বাহিরেও প্রভাব বিস্তৃত করিয়া থাকে। কোন্ দেশের কোন্ শিল্প কিরূপভাবে কতদূর পর্য্যন্ত ভারতশিল্পের উপর প্রধান্য বিস্তৃত করিয়াছিল, তাহার চিন্তাই এ পর্য্যন্ত তথ্যানুসন্ধানকে অবসরশূণ্য করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতশিল্প কোন কোন দেশের শিল্পের উপর কিরূপভাবে কতদূর পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তারে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহার তথ্যানুসন্ধান চেষ্টা অতি অল্পদিন হইতে আরব্ধ হইয়াছে ; এবং অল্পদিনের মধ্যেই অনেক বিস্ময়কর বিবরণ প্রচারিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষই যে সমগ্র প্রাচ্য শিল্পের "ভাবের মাতৃভূমি", ওকাকুরা তাহা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিবার পর সভ্য সমাজে ভারতশিল্প এক নূতন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় লাভ করিতে হইলে, প্রাচীন শিল্প-পরিচয় আবশ্যক। তজ্জন্য তথ্যানুসন্ধান অপরিহার্য্য। কিন্তু তাহা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। স্থায়িত্বের তারতম্যে প্রাচীন শিল্প দুই ভাগে বিভক্ত,—বিনশ্বর এবং অবিনশ্বর। উপকরণের পার্থক্যে এই পার্থক্য অনিবার্য্য। অল্পক্ষণের সাময়িক সৌন্দর্য্য সম্ভোগ লালসা যে সকল সাজসজ্জায় আত্মপ্রকাশ করে, তাহা অল্পক্ষণের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। জনসমাজের রুচি পরিবর্ত্তনে তাহার রচনা-প্রয়োজন তিরোহিত হইয়া গেলে, তাহার

নিদর্শন-দর্শনের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া যায়। যে সকল কারু-শিল্প বা চারু-শিল্প অপেক্ষাকৃত অধিক স্থায়িত্ব লাভের প্রয়াস প্রকাশে দৃঢ়তর উপাদানে রচিত হয়, তাহাও দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারে না, এবং রুচি-পরিবর্ত্তনে তাহার নির্ম্মাণ-প্রয়োজন তিরোহিত হইয়া গেলে, তাহার নিদর্শনও বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। যাহা সুদৃঢ় উপাদানে গঠিত বলিয়া, অবিনশ্বর শিল্প নিদর্শনরূপে, যাবচ্চন্দ্র দিবাকর স্থায়িত্যলাভের অন্য স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাও আততায়ীর আক্রমণে ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইয়া যায়;—তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট অসম্যক্ নিদর্শন পূর্ব্বসৌন্দর্য্যের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। এই সকল কারণে, প্রাচীন শিল্প-পরিচয় প্রাচীন সাহিত্যের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে। যাহার নিদর্শন লুপ্ত অথবা অসম্পূর্ণ, সাহিত্যের মধ্যেই তাহার পরিচয় লাভের চেষ্টা করিতে হয়।

প্রাচীন শিল্প-নিদর্শনের ন্যায় প্রাচীন সাহিত্যেও অসম্যক্ নিদর্শন;—তাহাও অক্ষত কলেবরে কালসাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন নাই। যাহা নাই, তাহার তুলনায়, যাহা আছে, তাহা যৎসামান্য;—কেবল তাহাই নহে,—লিপিকর প্রমাদে, প্রক্ষিপ্তদোষে, সংক্ষিপ্তানুরাগে, বিপর্য্যস্ত! যাহা এইরূপে কোনও ক্রমে ছিন্ন ভিন্ন কলেবরে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারও অধিকাংশ এখনও অমুদ্রিত। তাহা হস্তলিখিত পুঁথির আকারে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। অসীম অধ্যবসায়ে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, অপরিসীম অর্থব্যয়ে, তাহা একত্র সংগৃহীত হইতে পারিলেও, সকল সময়ে পাঠোদ্ধার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় না; অর্থবোধেও বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। তথাপি এই পথই প্রধান পথ, তজ্জন্য এই পথেই সভ্যসমাজ তথ্যানুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে।

যে সকল শিল্প-নিদর্শন এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহারও অধিকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া, লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থিত করিতেছে। যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্য ভাবে খনন কার্য্যের পর্য্যাপ্ত

ব্যবস্থার অভাবে, অতি অল্প সংখ্যক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাহিত্য-নিহিত বিবরণ এবং এই সকল নিদর্শন প্রাচীন শিল্প পরিচয় উদ্ঘাটিত করিবার অসম্পূর্ণ উপায়। তথাপি তাহার সাহায্যে যাহা কিছু শিল্পতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই একমাত্র সম্বল।

এই সম্বল, লিখিত ইতিহাসের তুলনায়, নিতান্ত দুর্বল বলিয়া কথিত হইলেও উপেক্ষিত হইবার অযোগ্য। একটি বিষয়ে লিখিত ইতিহাস অপেক্ষা অলিখিত শিল্প-নিদর্শন অধিক অভ্রান্ত পরিচয়ের আধার। লিখিত ইতিহাসে ব্যক্তি বিশেষের, সম্প্রদায় বিশেষের, অথবা রাজনীতি বিশেষের পক্ষপাত-দুষ্ট একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত-সংস্থাপন চেষ্টা প্রকৃত সত্যকে বিকৃতি দান করিতে পারে। শিল্পনিদর্শন সেরূপ নহে। তাহাও এক শ্রেণীর ভাষা ; কিন্তু তাহাতে ব্যক্তি-বিশেষের প্রভাব অপেক্ষা সমসাময়িক জনসমাজের প্রভাবই অধিক সুব্যক্ত ;—তাহাদের যাহা আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা, মত ও বিশ্বাস, তাহাই অকপটে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়ের প্রয়োজন যতই অনুভূত হইতেছে, তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টা সভ্যসমাজে ততই আন্তরিকতা লাভ করিতেছে। ইহার আলোচনায় যে দেশ যত অধিক অগ্রসর হইতেছে, সেই দেশ ততই মানব-তত্ত্ব অধ্যয়নের উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহা জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিয়া দিয়া, মানসিক সজীবতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। শিল্পতত্ত্বের আলোচনা এইরূপে উচ্চশিক্ষার অংগীভূত হইয়া, সভ্যসমাজের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়কে অল্পদিনের মধ্যে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে ; ইতিহাসকেও আখ্যায়িকার সংকীর্ণ ক্ষেত্র হইতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে।

শিল্পতত্ত্ব নৃতত্ত্বের অংগ-বিদ্যা। তাহাতে কল্পনার অধিকার নাই। সমুচিত বিচার পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিলে, সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না। বিচার-পদ্ধতি যে প্রমাণের উপর নির্ভর করে, শিল্প-পরিচয় সেই প্রমাণ। শিল্পপরিচয় সঙ্কলন করিবার প্রয়োজন উত্তরোত্তর

অধিক অনুভূত হইতেছে।

অনেকে শিল্পকেই শিল্প পরিচয়ের একমাত্র নিদান মনে করিয়া থাকেন। তাহারা অধ্যয়ন-নিপুণতা দর্শন-নিপুণতার অধিক পক্ষপাতী। কিন্তু দর্শন-নিপুণতার অভাব না থাকিলেও,—অধ্যয়ন-নিনপুণতার অভাব,—অনেক শিল্পের মর্ম্ম কথা সম্যক্ উদ্ঘাটিত হইতে পারে না।

শিল্প সকলকেই আনন্দ দান করে, কিন্তু সকলকেই এক শ্রেণীর আনন্দ দান করিতে পারে না। অধিকার ভেদে, চিত্রের এক এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য এক এক শ্রেণীর দর্শকের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়া থাকে। ইহা বুঝাইবার জন্য বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে (৩।৪১।১১) লিখিত হইয়াছে,—রেখা-বিন্যাস আচার্য্যগণের নিকট, বর্ণনাবিন্যাস অভিজ্ঞগণের নিকট, অলঙ্কার-বিন্যাস রমণীগণের নিকট, এবং বর্ণবিন্যাস জনসাধারণের নিকট প্রশংসালাভ করিয়া থাকে। যথা,—

"রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি, বর্ণাঢ্য মিতরে জনাঃ॥

ভারত-শিল্পতত্ত্ব (২)

মানব-ভাষা যখন পর্য্যাপ্ত বিকাশ লাভ করে, তখন তাহার শব্দানু-শাসনের জন্য ব্যাকরণ-রচনার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। তাহা অসংযত স্বেচ্ছাচার সুসংযত করিয়া, রচনা-প্রতিভার উন্নতি সাধন করে। শিল্পের অবস্থাও সেইরূপ। তাহার ব্যাকরণের নাম—"শিল্প-শাস্ত্র।"

এই সরল সত্যের মর্ম্মানুসন্ধান না করিয়া, অনেক শিল্প-সমালোচক শিল্প-শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন;—তাহাকে শিল্পের অধোগতির নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেও ইতস্ততঃ করেন না। অনেকের নিকট শিল্প-শাস্ত্র অনাবশ্যক শাসন-শৃঙ্খল বলিয়া নিন্দিত;—নিতান্ত আধুনিক রচনাশ্রম বলিয়া উপেক্ষিত। ইতিহাস-লেখকের নিকট তাহা অবিচারে উপেক্ষিত হইতে পারে না।

ভারত-শিল্পশাস্ত্র কত পুরাতন, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে না। অতি পুরাতন বলিয়াই তাহার জন্ম-কথা জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথমে সূত্রের, তৎপরে বৃত্তির এবং তৎপরে ভাষ্যের আবির্ভাবের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিল্প-সাহিত্যেও এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাপ্রচলিত সূত্র-বৃত্তি ভাষ্য উত্তরকালে শিল্প-শাস্ত্র নামে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং শিল্প-শাস্ত্রের রচনা-যুগ শিল্প-সাহিত্যের আদি যুগ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তাহা আরম্ভ নহে পরিণতি।

ভারত-শিল্পশাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তাহা যে আদি গ্রন্থ নহে, তাহাতেই তাহা উল্লিখিত আছে। শিল্পশাস্ত্র একটী স্বতন্ত্র শাস্ত্র নহে, তাহা বাস্তুবিদ্যার অন্তর্গত। ইহাতে অতি প্রাচীনত্বেরই ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব-সভ্যতার প্রথম সোপান—বাস্তুরচনা। গৃহনির্ম্মাণ কৌশল অধিগত করিয়াই মানব-সমাজ নানাবিধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি লাভের অধিকারী হইয়াছে। গৃহকে কেবল প্রয়োজন-

সাধনের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়াই মানব-সমাজ নিরস্ত হইতে পারে নাই ;—তাহাকে সাজসজ্জায় সুশোভিত করিবার আকাঙ্ক্ষা বিবিধ শিল্প-কৌশল উদ্ভাবিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং বাস্তুবিদ্যাকেই শিল্পবিদ্যার মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনও দেশে শিল্পবিদ্যা এরূপ ভাবে বাস্তুবিদ্যার অঙ্গীভূত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই ; বরং বাস্তুবিদ্যা এক শ্রেণীর শিল্প-বিদ্যা বিবেচিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের ধারণা অধিক বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া বোধ হয়।

ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজক মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতাদি ঋষিগণের নাম এখনও হিন্দু-সমাজে পঠিত হইয়া থাকে ; কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র-প্রয়োজকগণের নাম হিন্দুর নিকটেও অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে ! বিংশ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজকের নামের ন্যায় অষ্টাদশ বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকের নামও এক সময়ে তুল্যভাবেই সুপরিচিত ছিল। যথা—

"ভৃগুরত্রির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্ম্মা ময়স্তথা।
নারদো নগ্নজিচ্চৈব বিশালাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
ব্রাহ্ম কুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এবচ।
বাসুদেবোঽনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্র-বৃহস্পতি।
অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকাঃ ॥"

মৎস্যপুরাণোক্ত এই অষ্টাদশ বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকের মধ্যে অনেকের, গ্রন্থই কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্ট শতাব্দীতে "বৃহৎ সংহিতা" সঙ্কলিত করিবার সময়ে, বরাহমিহির গর্গ-বিরচিত বাস্তুশাস্ত্রের সারাংশ সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে নগ্নজিতাদির মতামতও স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। শতবর্ষ পূর্ব্বেও, ইংরাজী-ভাষায় গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া রামরজ দক্ষিণভারত-প্রচলিত কোন কোন বাস্তুশাস্ত্রের বিলুপ্তপ্রায় অংশ বিশেষের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল অধুনাবিলুপ্ত প্রাপ্ত গ্রন্থ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বাস্তুজ্ঞান সূত্রাকারে বর্ত্তমান ছিল। বাস্তুসূত্রের, বাস্তুশাস্ত্রের, এবং তদঙ্গীভূত

শিল্পশাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলি অল্পাধিক মাত্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি অন্যান্য গ্রন্থে আলোচিত হইয়া, সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে, মৎস্যাদি পুরাণে উপপুরাণে, হিন্দু বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থে, প্রতিষ্ঠা-নিবন্ধে, শুক্রনীতিসারে, যুক্তিকল্প এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয় সঙ্কলিত করিতে হইলে, এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। প্রাচ্যকাব্যে, দৃশ্যকাব্যে, আখ্যায়িকায়, এমন কি, সকল শ্রেণীর গ্রন্থেই প্রাচীন শিল্পের অল্পাধিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য সকল গ্রন্থই অধ্যয়ন করা আবশ্যক। একে গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, তাহাতে কোষ গ্রন্থের বা প্রচলিত টীকার সাহায্যে সকল স্থলের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। এই সকল কারণে, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে মানব-শিল্প বিষয়-নিরপেক্ষ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। কারণ, সকল দেশের শিল্পের মধ্যেই প্রচলিত বিষয়বিশেষের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতশিল্প যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া, আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে ভারতবর্ষের বিশিষ্টতার পরিচয় প্রদান করে। তজ্জন্য ভারতবর্ষকেই ভারতশিল্পের উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

এক সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ইহার প্রতি প্রণিধান না করিয়া, ভারত-শিল্পতে পরানুকরণজাত বলিয়া বর্ণনা করিবার জন্যই প্রয়াস স্বীকার করিতেন। কালক্রমে তাহার গতি ক্রমশঃ মন্থরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন একটি আদি ও অকৃত্রিম ভারতশিল্পের অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশের অভ্যাস পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন কেবল ভারতশিল্পের উপর বিদেশীর প্রভাবের ছায়াপাত সম্বন্ধেই আলোচনা সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তাহা যে ভারতীয়ভাবে রূপান্তরিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় আকার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকৃত হইতেছে।

গ্রীকগণ ফিনিসীয়দিগের নিকট বর্ণমালা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার সেই বর্ণমালার সাহায্যে ফিনিসীয় সাহিত্য রচনা করেন নাই,— গ্রীক সাহিত্যই রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষও যদি কোনও বিদেশের নিকট হইতে কোনও শিল্প-কৌশল গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার সাহায্যে ভারতশিল্পই রচিত হইয়াছে ; বিদেশীয় শিল্প ভারতবর্ষে প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং ভারত-সাহিত্যের ন্যায় ভারতশিল্পও ভারতবর্ষের নিজস্ব। পণ্যের আদান-প্রদানের ন্যায় জ্ঞানের আদান-প্রদান সকল দেশেই সুপরিচিত। তাহাতে কাহারও শিল্প-মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং উত্তরোত্তর বিবিধ বিষয়ে নূতন নূতন রচনা প্রতিভা বিকাশ লাভের অবসর প্রাপ্ত হয়।

কিরূপ উপাদানে ভারতশিল্প প্রথমে আত্মপ্রকাশ করিবার সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহার সন্ধান লাভের উপায় নাই। অতি পুরাতন সাহিত্যে শিল্পের উল্লেখ দেখিয়া, এবং অতি পুরাতন শিল্পনিদর্শন দেখিতে না পাইয়া স্বতই মনে হয় যেন প্রথমে কেবল ক্ষণভঙ্গুর উপাদানে রচনা-বিকাশ করিয়া, ভারতশিল্প ক্রমে ক্রমে, স্থায়িত্ব লাভের কামনায়, দৃঢ়তর উপাদানের শরণাপন্ন হইয়াছিল। ভারত-স্থাপত্য এই অনুমানের পক্ষ সমর্থন করে। যাহা ইষ্টক-প্রস্তরে রচিত হইয়াছিল, তাহাও সহসা দারুগৃহ রচনা-কৌশল পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। অনেক পাষাণ-প্রাচীরে, এবং পাষাণ-তোরণে, দারু-কর্ম্মের সুপরিচিত প্রণালী অভিব্যক্ত হইয়া, তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে। মূর্ত্তি-শিল্পের ঈষদ্ভিন্ন রচনা-নিদর্শনের মধ্যেও তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতবাসীর জীবনযাপন-প্রণালীর সহিত ভারতশিল্পের যে নিগূঢ় সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ভারতবর্ষকেই ভারতশিল্পের উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অনেক শিল্প বিশেষভাবে বিশেষ প্রয়োজনে, কেবল ভারতবর্ষেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। অন্য কোনও দেশে তদনুরূপ শিল্পের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই শিল্পচর্চ্চা অল্পাধিক মাত্রায় অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা প্রতিদিবসের আহার-বিহারের

সহিত, অতিথি-অভ্যাগতের সম্বর্দ্ধনা-রীতির সহিত, উৎসব ও আনন্দ মিলনের বিধি ব্যবস্থার সহিত, নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মাচরণ পদ্ধতির সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছিল। তাহা গৃহপ্রাঙ্গণের অলিম্পন-প্রণালীতে বা কামিনীকুন্তলের প্রসাধন রীতিতে তুল্য ভাবেই অভিব্যক্ত হইত। এইরূপে ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত সমাজের নরনারীর পক্ষে চতুঃষষ্টি কলাজ্ঞান সুশিক্ষার নিদর্শন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহা সমাজের মর্য্যাদা দান করিত,—সৌভাগ্যের দিনে সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিত,—দুঃখ দুর্দ্দিনে জীবনোপায় হইত।

জীবন যাত্রার পুরাতন প্রণালী পরিবর্ত্তনে, ধর্ম্মাচরণের অনুষ্ঠান-বিলোপে, কলাজ্ঞানহীন বিদ্যা-শিক্ষার আধুনিক ব্যবস্থায়, ভারতবর্ষের চিরপরিচিত চতুঃষষ্টিকলা; অনুশীলনের অভাবে, অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যে নাটকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেও, তাহাকে কবি-কল্পনা মনে করিয়া, কেহ তাহার তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন স্বীকার করেন না।

চতুঃষষ্টি কলার নামগুলি এক এক গ্রন্থে এক এক ভাবে উল্লিখিত থাকায়, প্রথম দৃষ্টিপাতে পার্থক্যের কারণ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। বাৎস্যায়নোক্ত কামসূত্রের টীকাকার যশোধর ইহার রহস্য ভেদ করিয়া গিয়াছেন। চতুঃষষ্টি কলা অঙ্গ-বিদ্যা; তাহা যে গ্রন্থে যে মূলবিদ্যার অঙ্গ-বিদ্যারূপে উল্লিখিত, নামগুলি সেই মূল বিদ্যার উপযোগী। কাম-সূত্রোক্ত চতুষষ্টিকলা কামশাস্ত্রের অবয়বী, সুতরাং নামগুলি কামশাস্ত্রের উপযোগী। যে শাস্ত্রের যাহা অঙ্গ, সেই শাস্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে।

বাৎস্যায়নোক্ত চতুঃষষ্টিকলার সাধারণ নাম,—"ঔপোয়িকী,"—উপায়—সভ্য। শাস্ত্রান্তরে যে ভাবে কলাগুলি উল্লিখিত, তদনুসারে চতুর্বিংশতি "কর্ম্মাশ্রয়া",—নির্জীব সজীব ভেদে বিংশতি "দ্যূতাশ্রয়া,"—ষোড়শ "উপচারিকা";—এবং চারিটি "উত্তর কলা" নামে কথিত। এইগুলি "মূল-কলা", ইহাদিগের অন্তর্ণিবিষ্ট "অন্তর কলার" সংখ্যা পাঁচশত অষ্টাদশ। সমস্ত কলার সংখ্যা ৫৮২, তন্মধ্যে মূলবিদ্যা ভেদে তদঙ্গীভূত ৬৪ কলা

পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে; অবশিষ্ট কলাগুলি "অন্তরকলার" অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহা এক গ্রন্থে চতুঃষষ্টিকলার অন্তর্গত, তাহা অন্যত্র অন্তর-কলার অন্তর্গত; কেবল কতকগুলি সকল গ্রন্থেই সমান। নৃত্য গীত বাদ্য আলেখ্য সর্ব্ববাদী সম্মত মূল কলা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট সকলগুলি "সুকুমার কলা" বলিয়া সমাদর লাভ করিবে না। কারণ, এরূপ সূক্ষ্মস্য-সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য বিকাশ-ব্যবস্থা পাশ্চাত্য কলাশাস্ত্রে অপরিচিত। কিন্তু ভারতশিল্প জ্ঞাত হইতে হইলে, ইহাদিগের সমালোচনা অপরিহার্য্য। কোন্ বিশিষ্ট প্রণালীতে কিরূপ সূত্র ধরিয়া ভারতশিল্প বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার মধ্যে তাহারও সন্ধান লাভের সম্ভাবনা আছে।

অনেক আধুনিক শিল্প-সমালোচক ভারতশিল্পকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়াই বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন; এবং আকারে ইঙ্গিতে ধর্ম্মকেই মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছেন। এখনও যে সকল বিচিত্র দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ,—যে সকল শিল্প-সুষমা মণ্ডিত গিরিগহ্বর,—যে সকল জীর্ণ কঙ্কালাবিশিষ্ট স্তূপ-বিহার,—যে সকল ক্ষতাক্ষত শ্রীমূর্ত্তির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত। কিন্তু তাহাই ভারতশিল্পের একমাত্র নিদর্শন নহে। অন্যান্য নিদর্শন অপেক্ষাকৃত দুর্লভ,—কোন কোন নিদর্শন সম্পূর্ণরূপে অপ্রাপ্য তথাপি ভারতশিল্প যে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত-হইয়াই জন্ম লাভ করিয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত যে, আস্থা স্থাপন করা যায় না। ভারতবাসী কেবল ধর্ম্মাচরণে অবসর শূন্য হইয়াই জীবন যাপন করিত,—সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন ছিল,—এরূপ কল্পনা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীন শিল্প পরিচয় লোকসমাজে সুপরিচিত হইলে, এরূপ কল্পনা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইবে।

সভ্যতা বিকাশের প্রথমপ্রভাতে, অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও মানব সমাজ চিত্রাঙ্কনে চিত্তবিনোদন করিত। তাহার যে সকল অতি

পুরাতন নিদর্শন ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছে, তাহাতে মৃগয়া-চিত্রই দেদীপ্যমান। ইহলৌকিক অভ্যুদয়লাভের প্রয়োজন ও পথ ভারতবর্ষেও অপরিচিত ছিল না। সাংসারিক অভ্যুদয় সাধক শিল্প-নিদর্শন অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এখন ভারতবর্ষের পুরাতন অভিযান দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া দ্বীপ-দ্বীপান্তরে যাতায়াতের উপায় ভারতবাসীর অপরিজ্ঞাত ছিল,—এরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। ভারতবর্ষের সমগ্র পুরাতন সাহিত্যের তাহার প্রতিকুল প্রমাণ ভস্মীভূত হইয়া রহিয়াছে। সে সাহিত্য ভারত শিল্পকে ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করে নাই। তাহাতে বরং শিল্পবিদ্যা "দেবগণ-বিদ্যার" অন্তর্গত বলিয়াই উল্লিখিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭) (২) তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১]

অতি পুরাকালেই মানব-সমাজে ধনোপার্জ্জনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। তখন হইতে বাণিজ্যই লক্ষ্মীরনিবাস বলিয়া ভারতীয় জনসমাজে সুপরিচিত হইয়াছিল, এবং বিবিধ শিল্প বিস্তারের সহায়তা সাধন করিয়াছিল। ভারতীয় সূক্ষ্ম শিল্প বহু দূর দেশে নীত হইয়া, উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। শিল্প এইরূপে ধনোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। বাণিজ্য-ব্যাপদেশে নানা দেশের সহিত পরিচয় সংস্থাপিত হইবার পর, ভারতশিল্পের রচনা-কৌশল দিন দিন অধিক শক্তি লাভ করিয়াছিল—নানা দেশ হইতে উপাদান সংগ্রহের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, ভারতশিল্প প্রতিভা-বিকাশের অনেক নূতন ক্ষেত্রের সন্ধান লাভ করিয়াছিল, এইরূপে সেকালের বিদেশের সম্পর্ক ভারতশিল্পের অবনতির পথ উন্মুখ না করিয়া, উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল।

অভ্যুদয়-যুগের ভারত-শিল্পের সাধারণ লক্ষণে যাহা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বৃহৎ এবং সুন্দর;—সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন। ফার্গুসন্ তাহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অমিতব্যায়িতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে শিল্পব্যসন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতশিল্পের

পক্ষে তাহা কত স্বাভাবিক, তিনি তাহার বিচার করিবার জন্য প্রয়াস স্বীকার করেন নাই। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—এই ধারণা ভারত-স্থাপত্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৃহৎ এবং সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে যে শিল্প-প্রতিভা বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহা অজ্ঞাতসারে বৃহতের দিকে আকৃষ্ট হইয়া, বৃহতের আদর্শেই পরিচালিত হইয়াছিল।

বৃহতের আদর্শের অনুসরণ করিতে গিয়া, ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্প এক নূতন পথে ভাব প্রকাশে প্রশ্রয় লাভ করিয়াছিল। তাহা দেবমূর্ত্তিতে দুই বাহুর পরিবর্ত্তে বহু বাহুর, এক মস্তকের পরিবর্ত্তে বহু মস্তকের অবতারণা করিয়া, অলৌকিক রচনা-বিলাসকে অতিশয়োক্তিতে অলঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল। সাহিত্যের ন্যায় শিল্পেও অতিশয়োক্তি একটি সুপরিচিত অলঙ্কার, তাহা রচনা-দোষ বলিয়া বিবেচিত হইত না।

অসীম উপাদানে গঠিত, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সীমায় সুসংযত, দেবমূর্ত্তির মধ্যে অসীমের আভাস-প্রকাশ চেষ্টা ভারতশিল্পকে অতিশয়োক্তির অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার প্রভাবে ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্প বেশভূষার আতিশয্যেও উত্তরোত্তর অধিক ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি ভারতশিল্পের মূলসূত্র কোনও যুগেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। তাহা ভাব সূত্র,—রসানুগ ভাবৈশ্বর্য্যের বাহ্য-বিকাশ,—ধীর, শান্ত, সমাহিত, আত্মস্থ, আত্মতৃপ্ত। তাহাতে গতি আছে, চাঞ্চল্য নাই;—স্থিতি আছে, স্থবিরতা নাই;—বিলাস আছে, আবিলতা নাই। তাহা সান্ত নহে, অনন্ত;—দৃষ্টিগম্য নহে, ভাবগম্য। কি কারু-শিল্প, কি চারু-শিল্প, সকল শ্রেণীর ভারতশিল্পের মধ্যেই এই ভাবসূত্র তুল্যভাবে দেদীপ্যমান। ভারতশিল্পের নানাযুগে নানা রচনা-রীতি প্রচলিত হইয়াছিল; কিন্তু কোনও রীতিই মূলসূত্র বিস্মৃত হয় নাই।

সূত্র-পরিচিতি

১. ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"গন্ধ যুক্তি নৃত্য গীত বাদ্য শিল্পাদি বিজ্ঞানানি।"

ভারতশিল্পের মূলসূত্র কোথায় ;—ভারতবর্ষের বাহিরে না অভ্যন্তরে ? অনেকে ইহার আবিষ্কার-সাধনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। ইহাকে সুলক্ষণ বলিয়াই অভ্যর্থনা করিতে হইবে। কারণ, মানব-হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় ভাব-সম্পৎ যে ভাবে শিল্পের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে, তাহার পরিচয়লাভের জন্য আয়োজন না করিলে, মানব-সমাজের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। তাম্রপট্ট-লিপি, শিলাপট্ট-লিপি এবং লুপ্তাবশিষ্ট পুরাতন গ্রন্থ পুরাকালের নানা বিবরণের সন্ধান প্রদান করিতে পারে। তজ্জন্য তাহার আলোচনা ইতিহাস-লেখকগণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে ! পুরাকালের শিল্পনিদর্শনগুলিও সেইরূপ সমাদর লাভের যোগ্য ; তাহার মধ্যেও পুরাকালের নানা বিবরণের সন্ধান-লাভের সম্ভাবনা আছে।

ভারতশিল্প আদৌ শিল্পকলার নিদর্শন বলিয়া কথিত হইতে পারে কিনা, এক সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে তদ্বিষয়েই বিলক্ষণ সংশয় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। একখানি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—"ভারত-ভাস্কর্য্যের বিস্তৃত সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিবার প্রলোভন নাই। কারণ, শিল্পের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার সময়ে, তাহা হইতে সাহায্যলাভের আশা করা যাইতে পারে না। তাহা নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর কারুকার্য্যমাত্র ;—তাহাকে শিল্পকলা বলিয়া সমাদর করা যায় না।"[১]

বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। যাঁহারা গুণী, এবং গুণজ্ঞ, তাঁহাদিগের বিচারে, ভারত-শিল্প বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের "শিল্পকলার" মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন, ভারতশিল্পের উল্লেখ না করিলে শিল্পের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার উপায় নাই। কারণ, সমগ্র প্রাচ্য শিল্পেই ভারত-শিল্পের প্রভাব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে ; প্রতীচ্য-শিল্পের উপরও গৌণ-

ভাবে সে প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে। তথাপি, ভারত-শিল্পের প্রকৃত প্রকৃতি-বিচারে এখনও তর্ক বিতর্ক নিরস্ত হয় নাই, এখনও নানা মুনির নানা মতের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া, ভারতশিল্প নানা-রূপে বিপর্য্যস্ত হইতেছে।

অনেকের বিশ্বাস ;—ভারতশিল্প পরানুকরণ-লব্ধ। যাঁহারা সম্পূর্ণ-রূপে পরানুকরণ-লব্ধ বলিতে অসম্মত, তাঁহাদিগের বিশ্বাস,—ভারত-শিল্পে পরানুকরণ-সম্পর্কের অভাব ছিল না। যাঁহারা তাহার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ উপস্থিত করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগের বিশ্বাস,—ভারতবর্ষীয়গণ প্রতিভাবলে পরানুকরণকে ভারতবর্ষীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইয়াছে বলিয়া তাহা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।[২] এই সকল কারণে, ভারতশিল্পের মূলসূত্রের সন্ধান লাভের জন্য ভারতবর্ষের বাহিরে পর্য্যটন করিবার প্রবৃত্তি এখনও সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইতে পারে নাই ; এবং ইহাতেই ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যথাযোগ্য ভাবে অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত হইবার অধ্যবসায় ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে না। এখনও ভারতশিল্পের উপর গ্রীক শিল্প-প্রভাবের কথা আলোচিত হইতেছে।

ব্রসেলস-বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর মহোদয় তাহার আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়া, কয়েকটি সারগর্ভ বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে সুপরিচিত হইলেও, বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত। তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—"ভারত-সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক-সভ্যতার কিছুমাত্র সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল না, এরূপ কথা স্বীকার করিতে না পারিলেও, তাহাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য প্রদান করা যায় না। কারণ, উভয় দেশের মানব-সমাজে ধর্ম্মতত্ত্বের এবং দার্শনিক তত্ত্বের যুগপৎ উন্মেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। জ্যোতিষে এবং চিকিৎসা-বিদ্যায় গ্রীসের নিকট ভারতবর্ষের যৎকিঞ্চিৎ ঋণ থাকিতে পারে ; কিন্তু এই দুইটি বিদ্যাও উভয় দেশে স্বতন্ত্রভাবেই বিকশিত হইবার সূত্রপাত করিয়াছিল। কাব্যে, নাটকে, ব্যাকরণে, লিপিকৌশলে, গণিতে বা কলাশিল্পে ভারতবর্ষের উপর গ্রীসের প্রভাব কল্পিত হইতে পারে

না। কারণ, গ্রীসের সহিত পরিচয় লাভ না করা পর্য্যন্ত, এ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষ নিশ্চেষ্টভাবে কালযাপন করিতে পারে নাই। পরিচয় সংস্থাপিত হইবার পর, গ্রীক-শিল্পের প্রভাবে ভারত-ভাস্কর্য্যে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে ভারতশিল্পের স্বাতন্ত্র্য এবং রচনা নৈপুণ্য বিনষ্ট হইতে পারে নাই।"[৩]

শিল্পকলার মূলচেষ্টা বিকাশ-চেষ্টা। যে প্রাকৃতিক বিকাশ চেষ্টায়, বৃক্ষলতা ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করিতে গিয়া, যথাকালে পুষ্পফলে সুশোভিত হয়, সেই প্রাকৃতিক বিকাশ-চেষ্টাই মানবসমাজকেও শিল্পকলায় আত্মবিকাশ লাভ করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়া থাকে। শিল্পকলার মূল-সূত্র মানব প্রকৃতিতে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। মানব-সমাজ বহুদেশে, বহুজাতিতে বিভক্ত হইয়া, নানাভাবে বিকাশ-লাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। যে দেশের, যে যুগের, যে মানবসমাজ যেভাবে অনুপ্রাণিত, তাহার শিল্পকলার মূলসূত্র তাহার মধ্যেই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহা বাহিরে নহে,—অভ্যন্তরে। অল্পদিন হইল, ইহার উপলব্ধি করিয়া, মানবতত্ত্বশাস্ত্র নূতন পদ্ধতিতে তথ্যালোচনা করিবার জন্য মুনিঋষিগণকে বিবিধ অনুসন্ধান-চেষ্টায় ব্যাপৃত করিয়াছেন। এক দেশের সহিত অন্য দেশের কোন কোন বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদান প্রচলিত হইলেও, তাহাতে বিকাশ-চেষ্টার মূলপ্রকৃতি পরবর্ত্তিত হইতে পারে না। বিকাশ চেষ্টার সাদৃশ্য মাত্র লক্ষ্য করিয়াই, এক দেশের নিকট আর এক দেশের ঋণ থাকা সিদ্ধান্ত করা যায় না। সে সাদৃশ্য হয়ত জাতিগত বা প্রকৃতিগত কোনরূপ বিলুপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয়-বিজ্ঞাপক অপরিহার্য্য সাদৃশ্য।

ভারতবর্ষের সহিত পুরাকালেও অনেক দূর দেশের পরিচয় ছিল। বাণিজ্য-ব্যপদেশে সে পরিচয় কখন ক্ষণস্থায়ী কখনওবা দীর্ঘস্থায়ী পরিচয়-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহার প্রসাদে ভারতবাসিগণ নানা দূর-দেশ হইতে ধনরত্ন আহরণ করিবার সময়ে, কখনও যে কোনরূপ জ্ঞানরত্ন আহরণ করেন নাই, তাহা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভারতবাসিগণ

শিল্পকলার বিকাশসাধনে দূরদেশ হইতে কখন কিরূপ রচনা-কৌশল আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান-কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ভারতশিল্পের মূল-প্রকৃতিতে তাহার পরিচয়-লাভের উপায় নাই। ভারতবর্ষ কখন কখন ভিন্নদেশ হইতে শব্দসম্পৎ আহরণ করিয়া আনিয়াছে; কিন্তু তাহার প্রভাবে ভারতবর্ষের ভাষার মূলপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় নাই। সেইরূপ প্রয়োজনে ভারতবর্ষ কখনও ভিন্ন দেশের শিল্পরীতি হইতে কোনরূপ নূতন রচনা-কৌশল আহরণ করিয়া থাকিলেও, তাহাতে ভারতশিল্পের মূলপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। ভারতশিল্পে একটি অনন্য সাধারণ বিকাশ-চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সহিত ভারতবর্ষের আর্য্য অনার্য্য সকল শ্রেণীর অধিবাসীর পরম্পরাগত শিক্ষাদীক্ষার সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাকে বাহির হইতে আহৃত শিক্ষাদীক্ষার নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষই তাহার প্রকৃত মিলনভূমি।

ভারতশিল্পের ইতিহাস বিষয়ক সদ্যঃ প্রকাশিত গ্রন্থে ভিন্সেন্ট স্মিথ স্বীকার করিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের পূরা প্রচলিত শিল্প-সংস্কার অতিক্রম করিয়া, গ্রীকশিল্পের রচনারীতি এবং রচনা-মান ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। হিন্দুশিল্পের প্রকৃত গুণাবলী সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুশিল্প আদ্যন্ত হিন্দুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে, গ্রীক-সংস্কারের বশবর্ত্তী হয় নাই। কেবল সাজ-সজ্জার মধ্যেই বিদেশাগত শিল্প-প্রভাবের পরিচয় খুঁজিয়া বাহির করা যাইতে পারে, তাহা বাহ্য প্রভাব মাত্র।"

এই বাহ্য প্রভাব ভারতবর্ষের সকল যুগের সকল প্রদেশের শিল্পকলার মধ্যে আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই। যে যুগের যে প্রদেশের শিল্পকলায় ইহার পরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়া, মনীষিগণ "গান্ধার-শিল্প" বলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন। "গান্ধার-শিল্পের" লক্ষ্য কি ছিল, এখনও তদ্বিষয়ক সকল তর্ক নিরস্ত হইয়াছে

বলিয়া বোধ হয় না। তাহা কি ভারতশিল্পকে গ্রীক ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল? যে সকল নিদর্শন বর্ত্তমান আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—"গান্ধার-শিল্প" গ্রীক-শিল্পকেই ভারত-ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে চেষ্টা যখন সফল হইয়াছিল, তখন "গান্ধার-শিল্পের" স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যত দিন সে চেষ্টা সফল হয় নাই, ততদিন সফলতা লাভের আয়োজন চলিতেছিল। যে সকল শিল্পনিদর্শনে সেই আয়োজনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই "গান্ধার-শিল্প" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। তাহাকে গ্রীক-শিল্প বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ভারতবর্ষই তাহার প্রকৃত উদ্ভব-ক্ষেত্র।

ভারতশিল্পকে বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করিবার উপায় থাকিলে, তাহাকে সহজেই আয়ত্ত করিবার সম্ভাবনা থাকিত। ভারতশিল্প ভারত-সমাজের সকল প্রকার আত্মবিকাশচেষ্টার সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই, সহসা সকল কথার মীমাংসা-সাধনের উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সংস্থান, তাহার সভ্য অসভ্য সমগ্র মানবসমাজ, ভারতবর্ষের আত্মবিকাশ-চেষ্টার গতি নির্দ্দেশ করিয়াছে;—ভারতবর্ষের "প্রচণ্ড সূর্য্যঃ স্পৃহনীয় চন্দ্রমা" তাহার গতি নির্দ্দেশ করিয়াছে; ভারতবর্ষের জল-স্থল-অন্তরীক্ষ, বৃক্ষ-বনস্পতি-পর্ব্বতমালা, নদনদী-মহাসাগরও তাহার গতি নির্দ্দেশ করিয়াছে। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না; ইতিহাসকে উপেক্ষা করিয়াও, শিল্প-সৌন্দর্য্য আলোচিত হইতে পারে না এই সরল সত্যটি এখনও ভাল করিয়া প্রতিভাত হয় নাই।

ভারতশিল্পের মূল-সূত্র কোথায়, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—ভারতবর্ষীয় মানব-সমাজের মূলপ্রকৃতি কোথায়? তাহা বাহিরে, না অভ্যন্তরে? সে প্রকৃতি যে চিরকালই আত্মনিষ্ঠ ছিল, তাহার প্রমাণাবলীর অভাব নাই। যাহারা যখন ভারত-ভূমিতে আপতিত হইয়াছে, তাহারাই (কিয়ৎকালের মধ্যে) ভারতবর্ষীয় হইয়া গিয়াছে। প্রবল সমাজের পক্ষে এইরূপে ক্ষুদ্র সমাজকে আত্মসাৎ

করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই, ভারতবর্ষ বহু বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়া, এখনও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় নাই। এখনও সেকাল-একালের মধ্যে কালগত পার্থক্যই উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ;—প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। এখনও ভারতবর্ষের প্রধান আকাঙ্ক্ষা বাহিরে নহে, অভ্যন্তরে,—সান্তে নহে, অনন্তে ;—পরিদৃশ্যমান বস্তুতে নহে, অতীন্দ্রিয় মহাসত্ত্বায়।

আমরা কিছুই জানিতে পারি না ;—ইহা সত্য হইতে পারে না। আমরা সমস্তই জানিতে পারি ;—ইহাও সত্য হইতে পারে না। মানব-জ্ঞানের এই সীমানির্দ্দেশের মধ্যে, তাহার অসীম ক্ষমতার পরিচয় লাভ করিয়া, ভারতবর্ষ অচিন্ত্যকে চিন্তা করিবার এবং অনির্ব্বচনীয়কে বাক্যে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিতে সাহসী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সাহসেই, প্রাচীন কালের ভারতবর্ষ, গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করিতে সম্মত হয় নাই। তাহাকে গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া, তাহার ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহা ভারত-শিল্পের ইতিহাসেও সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

যে সকল দেশে শিল্পকলা, কেবল পরিদৃশ্যমান আকারকে অবলম্বন করিয়া, আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, সে সকল দেশের শিল্পকলার সহিত ভারত-শিল্পকলার জ্ঞাতিত্ব কল্পিত হইতে পারে না। ভারত-শিল্পকলা আকারের ভিতর দিয়া ভাব ফুটাইবার চেষ্টা না করিয়া, ভাবকেই আকার-দানের চেষ্টা করিয়াছিল। তজ্জন্য ভারতবর্ষের সকল যুগের মূর্ত্তি-শিল্পেরই মূলপ্রকৃতি একরূপ ;—তাহা আভাসাত্মক। অনির্ব্বচনীয়ের আভাস প্রকাশ করিয়াই তাহা কৃতকৃতার্থ। তাহার মূল সূত্র ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

কেবল শিল্প-সৌন্দর্য্যের বিচারেই এই মূলসূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়ের অভাব নাই। ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে বুঝিবার পথই প্রকৃত পথ ;—সেই পথে ভারতশিল্পের মূলসূত্র আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা শ্রমসাধ্য বলিয়া, তাহাতে সহসা পদার্পণ

না করিয়া, অনেকে প্রতিভাবলেই ভারতশিল্পের ব্যাখ্যা-কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ইতিহাস এইরূপে উপেক্ষিত হইলে, সত্যনির্ণয় করা সহজ হইবে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ভারতশিল্পের মূলসূত্রের সন্ধান লাভ করিতে হইলে, ভারতবর্ষের জনসমাজের সর্ব্ববিধ আত্মবিকাশ চেষ্টার ইতিহাস সঙ্কলিত করিতে হইবে।

ফার্গুসন্ তাহার অমরগ্রন্থে একটি কাল্পনিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"ভারতশিল্পে হিন্দু বৌদ্ধ এবং জৈন নামক তিনটি রচনারীতি দেখিতে পাওয়া যায়।" তাহাকে মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করিয়া, অনেকেই ভারতশিল্পকে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন নামক তিনটি বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভারতশিল্পের মূল প্রকৃতি সর্ব্বত্র সকল যুগে একরূপ হইলেও, যুগে যুগে নানা স্থানে নানা রচনারীতি মূলসূত্রের ভাষ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে কেবল স্থান-কালের প্রভাবেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, ধর্ম্মসম্প্রদায়-সমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রভাবই শিল্পের পক্ষে একরূপ। অনির্ব্বচনীয়কে আকার-দানের চেষ্টাতেই তাহার পরিসমাপ্তি। ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মূল প্রস্রবণ এক-স্থানে বলিয়াই ভারতবর্ষ সমন্বয়-ক্ষেত্র। তাহার প্রভাব শিল্পের ইতিহাসেও দেদীপ্যমান।

যাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহা ভীষণে মধুরে মিশিয়া রহিয়াছে। তাহা অণু হইতে অণু এবং মহান্ হইতেও মহীয়ান্। যে যুগে যে প্রদেশে তাহা যে ভাবে মানব-মনকে বিকাশ-চেষ্টায় প্রণোদিত করিয়াছে; সেই যুগের সেই প্রদেশের রচনারীতিতে [সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মূর্ত্তিশিল্পেই] তাহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহা কোন কোন যুগে কোন কোন প্রদেশে ভীষণের ভিতর দিয়া, মধুরের ভিতর দিয়া, কিম্বা ভীষণ-মধুরের ভিতর দিয়া, অনির্ব্বচনীয়কে আকার-দানের চেষ্টা করিয়াছে। তৎকালের তৎপ্রদেশের জনসমাজ তাহা জানিত। সুতরাং আমরা যাহাকে

ভীষণ বলিয়া ভ্রূভঙ্গী বিকাশ করি, তাহারা তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য-সম্ভোগে বঞ্চিত হইত না। মৃত্যু অমৃতের সোপান বলিয়া আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইত, তাহাদিগের দৃষ্টি নিকটে নহে,—দূরে। তাহারা সকল যুগের সকল প্রদেশের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মূর্ত্তিশিল্পের মধ্যে অমৃতকেই দর্শন করিত। আমরা মূর্ত্তিমাত্র দর্শন করিয়া, বিজ্ঞতার পরিচয় দান করিবার জন্য বলিতেছি,—কোনও মূর্ত্তি ভীষণ, কোনও মূর্ত্তি মধুর, সকল মূর্ত্তি অল্পাধিক অস্বাভাবিক।

ভারতবর্ষে স্বাভাবিক মূর্ত্তিরচনারও অভাব ছিল না; এখনও নানা স্থানে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি ভারতশিল্প দেবমূর্ত্তি-রচনার সময়ে স্বভাবানুকরণ করিতে সম্মত হয় নাই কেন, তাহার নিগূঢ় কারণ বিদ্যমান ছিল। মানবমূর্ত্তিকে দেবমূর্ত্তির আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে ভারত-শিল্পাচার্য্যগণকেও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নরনারী রচনা করিয়াই নিরস্ত হইতে হইত। কিন্তু তাহাতে ভারতশিল্পের মূলসূত্রটি ছিন্ন হইয়া পড়িত। প্রয়োজনের অনুরোধেই ভারতশিল্প সে পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে নাই। বাহিরের পট হইতে সাদৃশ্য আহরণ না করিয়া, চিত্তপট হইতে সাদৃশ্য আহরণ করিতে গিয়াই, ভারতশিল্প এক অনন্যসাধারণ শিল্পসূত্রের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহা কদাপি পরানুকরণ-লব্ধ বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

ভারতশিল্প সুন্দর কি না, তাহা ইতিহাসের বিচারযোগ্য বিষয় বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কিরূপ কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা ভারতশিল্পকে অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে, তাহার প্রভাবে কোন প্রদেশের কোন যুগের ভারতশিল্প কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাই কেবল ইতিহাসের বিচার-যোগ্য কথা। তাহার প্রথম এবং প্রধান কথা,—ভারত-শিল্পের মূলসূত্রের কথা। তাহা বাহিরে না, অভ্যন্তরে,—সর্ব্বাগ্রে তাহারই আলোচনা শেষ করা কর্ত্তব্য।

সূত্র-পরিচিতি

১. There is no temptation to dwell at length on the Sculpture of Hindustan. It affords no assistance in tracing the history of art, and its debased quality deprives it of all interest as a phase of Fine Art.—Westmacott's Handbook of sculpture. p.51

২. India, of course, has borrowed many things from abroad during the long course of ages, but it is a trite observation, easily proved by many instances, that she always so transmutes her borrowings as to make them her own.—Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon, p.7.

৩. Greece has played a part, but by no means a predominant part, in Indian civilization. The evolution of philosophy and religion has gone along parallel, but independent paths. India owes to Greece an improvement in astronomy and medicine, but it had begun both, and in lyric and epic poetry, in grammar, the art of writing, the drama, mathematics and the fine arts, it had no need to wait for the introduction or the initiative of Hellenism. Notably, howoever, in the plastic arts, and perhaps also in the details of dramatic representations, the classical culture has acted as a ferment to revivify the native qualities of the Indian artists without robbing them of their originality and Subtlety."—Journal of the Royal Asiatic Society (1898), pp. 188-189.

৪. Greek artistic cannons and rules of proportion never succeeded in making headway against the strong current of Indian tradition. Hindu sculpture, whatever may be thought of its intrinsic quality continued to be Indian on the whole, guided by Indian not Gaeek principles. The foreign influences, Assyrian, Persian, or Greek, had marely superficial effect, chiefly traceable in decorative details.—Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon, p.৮.

ভারতশিল্প কোন্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে এখনও কেহ কোনরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত স্থির সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতে পারেন নাই। তাহার সকল কথাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা। তাহা এখনও যথাযোগ্যরূপে লিখিত হইতে পারে না। এখনও উপকরণ-সংগ্রহের সকল চেষ্টা আরব্ধ ও পরিসমাপ্ত হয় নাই। সুতরাং, বর্ত্তমান অবস্থায়, ভারতীয় শিল্প প্রতিভা-বিকাশের প্রকৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ হইবার আশা করা যাইতে পারে না। সম্প্রতি অধ্যাপক হাভেল আবার একখানি গ্রন্থ[১] প্রকাশিত করিয়াছেন। এ বিষয়ের যত অধিক অলোচনা হইবে, ততই সত্যনির্ণয়ের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে। সুতরাং এরূপ উদ্যম সংবর্দ্ধনা লাভের যোগ্য। আরও একটি কারণে ইহা অধিক সংবর্দ্ধনা-লাভের যোগ্য। যাহা আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা এক জন ভিন্ন দেশের লেখক করিতেছেন ;—আমরা আমাদের নিজের দেশের কথাও তাঁহার প্রসাদে অধ্যয়ন করিতেছি।

উদ্দেশ্য সাধু। উদ্যম প্রশংসনীয়। গ্রন্থখানির আদ্যন্ত সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ। কোনও কোনও পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের গ্রন্থে কেবল ভারতশিল্পের নিন্দাবাদ। ইহাতে তৎপরিবর্ত্তে প্রশংসাবাদ। সুতরাং এরূপ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আগ্রহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার সকল কথা ইতিহাসের কথা বলিয়া মানিয়া লইবার উপায় নাই। সুতরাং ইহাতেও অভাবপূরণ হইল না। তথাপি, ইহাতে ভাবিবার কথার অভাব নাই।

গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তগুলি যে মূলভিত্তির উপর সংস্থাপিত, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত না হইলেও, গ্রন্থকারের পক্ষে দৃঢ় ভিত্তি। তিনি যেরূপ দৃষ্টিতে ভারতশিল্পকে দর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাহাই তাঁহার সকল সিদ্ধান্তের দৃঢ় ভিত্তি। সে দৃষ্টি কবিত্বপূর্ণ—উদারতাপূর্ণ—সৌন্দর্য্য-

লোলুপতাপূর্ণ। তাহা সকল সময়ে ঐতিহাসিক গবেষণার শুষ্কপদ্ধতির অনুসরণ করিতে সম্মত না হইলেও, স্থান-কাল-পাত্রের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া, ভারত শিল্প-প্রতিভার মূল প্রস্রবণের সন্ধান-লাভের জন্যই লালায়িত।

ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যের যে সকল লুপ্তাবশিষ্ট গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তাহার প্রতি সে দৃষ্টি এখনও যথাযোগ্যভাবে নিপতিত হয় নাই। বরং একদিকে যেমন পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের বহুবর্ষব্যাপী অনুসন্ধানে লব্ধ নানা সিদ্ধান্ত অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, অন্য দিকেও, সেইরূপ অবলীলাক্রমেই ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্য-নিহিত শিল্প-বিবরণের প্রতি অনাদর প্রকাশিত হইয়াছে।[২] তথাপি এরূপ গ্রন্থ উপাদেয়। কারণ, গ্রন্থ-কারের ভক্তি শ্রদ্ধা ও রচনা-প্রতিভা ইহাকে বিচার-বিতণ্ডার শুষ্কক্ষেত্র হইতে দূরে সংস্থাপিত করিয়া, বক্তব্য বিষয়কে কাব্যের ন্যায় মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। বুঝিবার চেষ্টাকে পরাহত করিয়া, বুঝাইবার চেষ্টাই সকলের উপর তাহার উচ্চ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এমন কি যে সকল দুরূহ তত্ত্ব অনির্ব্বচনীয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহাও যেন গ্রন্থকারের প্রতিভা-স্পর্শে সরলতা লাভ করিয়া, সকল সমস্যারই বিশদ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এরূপ চেষ্টা সকল স্থলে সর্ব্বাংশে সফল হইতে পারে না বলিয়াই, সফল হইতে পারে নাই। তাহাতে গ্রন্থের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

ভারতবর্ষ অনেকদিনের সভ্যদেশ। বেদ ও উপনিষৎ তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন। কিন্তু শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের একখানিও চিত্র বা প্রতিমা বর্ত্তমান নাই। এই ঐতিহাসিক বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন,—ভারতবর্ষের নিজের কোনরূপ শিল্পাদর্শ বর্ত্তমান থাকিলে, তাহা সভ্যতা-বিকাশের প্রথম প্রভাত হইতেই বিকশিত হইয়া উঠিত ;—তাহাতে এতকাল-বিলম্ব সংঘটিত হইতে পারিত না। কেহ কেহ এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই, ভারত-

শিল্পকে পুরানুকরণ-লব্ধ বলিয়াও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষ যেমন অনেক দিনের সভ্যদেশ, তাহার পুরাকীর্ত্তির অতি পুরাতন নিদর্শনও সেইরূপ অনেক মাটির নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। উপরে উপরে,—দশ বিশ হাত,—মাটী আঁচড়াইয়া, অতি পুরাতন কীর্ত্তি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়াই, "ছিল না" বলিবার উপায় নাই। অধ্যাপক হাভেল স্পষ্টাক্ষরে ইহার উল্লেখ করিয়াও,[৩] মানিয়া লইয়াছেন,—ভারতশিল্প চিত্রে ও প্রতিমায় বিকশিত হইয়া উঠিতে সত্য সত্যই কিছু বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছিল! তিনি এই কথাটি একটি ঐতিহাসিক কথা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন কেন, তদ্বিষয়ের কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই।

এই কথাটি মানিয়া লইয়া, ইহাকেই অধ্যাপক হাভেল তাঁহার অভিনব গ্রন্থের মূল-সূত্র-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই মূল-সূত্র বিচারসহ না হইলে, গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, ইহাকে একটি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াই, তাহার কারণ পরম্পরার আবিষ্কার-সাধনের চেষ্টা করিতে গিয়া, অধ্যাপক হাভেলের প্রতিভা যে সকল কারণের অবতারণা করিয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য। তাহা এইরূপ।—

বিলম্ব ঘটিয়াছিল সত্য। কিন্তু তাহার যথাযোগ্য কারণ পরম্পরার অভাব ছিল না। সে কারণকে "অজ্ঞতা" না বলিয়া "বিজ্ঞতা" বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, অতি পুরাকালের আর্য্যসমাজ, অনার্য্য-সংস্পর্শ-পরিহার কামনায়, সকল প্রকার জ্ঞান গৌরবই নিতান্ত সংগোপনে রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল; আর্য্যেতর জন সমাজের সংস্পর্শে তাহা যাহাতে কিছুমাত্র কলুষিত হইতে না পারে, তজ্জন্য যথাসাধ্য আত্মগোপন করিয়াছিল। সুতরাং শিল্প-প্রতিভা বিকশিত হইতে বিলম্ব ঘটিবারই কথা।

ইহার প্রমাণ,—প্রধান প্রমাণ,—গ্রন্থোক্ত একমাত্র প্রমাণ লিপিতত্ত্ব। লিপিকৌশল কোনওক্রমে আয়ত্ত করিবামাত্র, অন্যান্য সভ্যসমাজ তাড়াতাড়ি তাহাদের গভীর চিন্তাপ্রসূত সাধনলব্ধ পরমতত্ত্বনিয়ে অবলীলাক্রমে লিপিবদ্ধ

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্যসমাজ সেরূপ অশোভন ব্যগ্রতা প্রকাশে বিলক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়াছিল; সাধনলব্ধ পরমতত্ত্বনিচয়ে সহসা লিপিতে, চিত্রপটে, বা ভাস্কর্য্যে অভিব্যক্ত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশিত করিতে পারে নাই। তাহাদের সম্মুখে বাধাবিপত্তির অভাব ছিল না। তাহাতেই,—মর্য্যাদা-হানির আশঙ্কায় তাহাদিগকে সাবধান হইতে হইয়াছিল। তখনকার আর্য্য-অনার্য্য-সমাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং, অনার্য্য-সংস্পর্শ-পরিহার-কামনায়, তখনকার আর্য্য সমাজকে দূরে দূরে,—আত্মসমাজের অভ্যন্তরে,—সর্ব্বথা আত্মনিষ্ঠ হইয়াই বাস করিতে হইয়াছিল।

তাহাদের মানসপটে যে চিরসুন্দরের দিব্যজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত না, তাহা নহে। তাহারা তাহাকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য লিপির, চিত্রের, অথবা ভাস্কর্যের শরণাপন্ন হইতে সম্মত না হইয়া, নিভৃত হৃদয়-মন্দিরে তাহার পূজা করিয়াই কৃত কৃতার্থ হইত। সেই জন্য তাহাদের সে কালের শিল্প প্রতিভার আদি প্রস্রবণ, সেই চিরসুন্দরই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

যাহারা মানব সভ্যতার আদিযুগে সেই চিরসুন্দরকে দেখিয়াছে, চিনিয়াছে, উপভোগ করিয়াছে,—তাহার সহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভেদতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, জড় ও জীবের মধ্যেও ঐক্য বন্ধনের সন্ধানলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে,— তাহারাই তো মানব-সমাজের অকৃত্রিম আদি শিল্পী। তখন পৃথিবীর অন্যান্য জনপদ অজ্ঞানান্ধকার আচ্ছন্ন থাকিয়া, নীরবে অগৌরবে কালযাপন করিত।

এই কবিত্বপূর্ণ আলেখ্য শিল্পশিক্ষকের পদোচিত-প্রতিভাব্যঞ্জক তূলিকার বিন্যাসে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, ইহা সুন্দর। ইহা ইতিহাস হইলে, মানব জাতির ইতিহাসের অত্যুজ্জ্বল রত্নমুকুট।

তথাপি ইহাকে ইতিহাস বলিয়া মানিয়া লইতে সাহস হয় না। যাহারা চিরসুন্দরের সন্ধান লাভ করে, তাহারা কি আত্ম-গোপন করিতে পারে?

সেকালের ভারতীয় আর্য্যসমাজ কি সত্য সত্যই আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিত? তখনকার অনার্য্য-সমাজ নিবিড় বনানীর অভ্যন্তরে, আর্য্যসমাজ হইতে বহুদূরে, ভয়ে ভয়ে আত্মগোপন করিয়া বাস করিত,—সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই পরাভূত হইত। আর্য্যসমাজ কি তাহাদিগের সংস্পর্শ-শঙ্কায়, মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বিমর্দ্দিত করিয়া, নীরবে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল?

যাগযজ্ঞ ছিল, উৎসব আনন্দ ছিল, নৃত্যগীত ছিল, তারস্বরে মন্ত্রবাচন করিবার প্রথাও প্রয়োজন ছিল,—রাজধানী, রাজদুর্গ, রাজপ্রাসাদ ছিল,—হৃদয়ে সাহস, বাহুযুগলে অমিত বল, লোকজয়ে অপরাজিত উৎসাহ বর্ত্তমান ছিল। কেবল কি চিত্রে, বা ভাস্কর্য্যে পরমতত্ত্ব অভিব্যক্ত করিবার সময়েই তাহারা মৌনব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল? বিনা প্রমাণে, এত বড় কথা মানিয়া লইতে সাহস হয় না। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্য সাহস করিয়া এত বড় কথার সাক্ষ্যদান করিতে পারে না। অনুসন্ধানলব্ধ ঐতিহাসিক তথ্য ইহার সকল কথারই বিপরীত প্রমাণ পুঞ্জীকৃত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে উপহাস করা সহজ, অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অস্বীকার করিতে পারিলেও, সকল সংশয় নিরস্ত হয় না। যাহারা চির-সুন্দরের সন্ধান লাভ করিয়াও, দীর্ঘকাল মৌনব্রত রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহারা আবার কি কি কারণে, সহসা মুখর হইয়া উঠিয়াছিল? মুখর হইয়া উঠিয়াছিল সত্য;—তাহা অসংখ্য পাষাণ প্রতিমায় অভিব্যক্ত। কিন্তু কেন?

অধ্যাপক হ্যাভেল ইহার আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। কোন্ সময় হইতে আর্য্য সমাজ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি কেবল তাহারই পরিচয় দিবার জন্য লিখিয়াছেন,—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে ইহার আরম্ভ। সেই সময় হইতেই ভারতশিল্পের প্রকৃত অভ্যুদয়। কারণ, সেই সময় হইতেই বেদবাক্য লিপিবদ্ধ হইবার সূত্রপাত।[৪]

ইহাও ইতিহাস বলিয়া মানিয়া লইতে সাহস হয় না। খৃষ্টাবির্ভাবের

বহুপূর্ব্বে,—এমন কি, শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কালেরও বহু পূর্ব্বে, বেদমন্ত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছিল ; চিত্র ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে ইহার প্রমাণ লাভের সম্ভাবনা আছে।

যে যুগের চিত্র বা প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই শিল্প-প্রতিভার আদি যুগ বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। চিত্র বা প্রতিমা মানব-হৃদয়নিহিত নিগূঢ় ভাব-সম্পদের বাহ্য অভিব্যক্তি মাত্র। যে যুগে সেই ভাবসম্পৎ অর্জ্জিত হইয়াছিল, সেই যুগই শিল্প-প্রতিভার আদি যুগ,—ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার নাম 'বৈদিক যুগ'। সেই যুগের শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে, ধ্যান ধারণার মধ্যে আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই, ভারত-শিল্পের প্রকৃত আদর্শের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এ বিষয়ে অধ্যাপক হাভেল সত্য সত্যই প্রকৃত তথ্যের সন্ধান লাভ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

কেবল শিল্পাদর্শ কেন, ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার সকল আদর্শই বৈদিক যুগে অভিব্যক্ত হইয়াছিল,—উত্তরকালের আর্য্য সভ্যতা তাহারই পরিণত ফল। তজ্জন্য এখনও বহু যুগের বহু বিপ্লবের অবসানেও, আর্য্য সভ্যতার সকল স্তরেই তাহার প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। শিল্পের স্তরেই তদ্বৎ।

তাহার আদর্শ ইহলোকে নহে, পরলোকে ;—সান্ত পদার্থে নহে, অনন্তে ; —আকারে নহে, ভাবে। সেই জন্য ভারতশিল্পে একটি অনন্য-সাধরণ স্বাতন্ত্র্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা ভারতবর্ষের সুনীল আকাশ তলের চিরশান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। দীর্ঘকাল অন্য-সংস্পর্শের বাহিরে থাকিতে পারিলে, তাহা এখনও সেই ভাবেই বর্ত্তমান থাকিতে পারিত। তাহার মূল প্রকৃতি আধ্যাত্মিকতা।

অধ্যাপক হাভেল লিখিয়াছেন,—অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য, আধ্যাত্মিকতা ক্রমে ক্রমে তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণের আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়া-

কলাপের বাহুল্যে তাহা যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। শাক্য-বুদ্ধদেবের আর্বিভাবে আবার তাহা শক্তিলাভ করিয়া, আধাত্মদৃষ্টির প্রসার সাধন করিয়াছিল।"

এই যুগ অধ্যাপক হাভেলের গ্রন্থোক্ত দ্বিতীয় যুগ—ভারতশিল্পের অভ্যুদয়-যুগ—ভাবের আদান-প্রদানের কল্যাণযুগ,— নিখিল-মিলন যুগ বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য ভারতবর্ষের গৌরব-যুগ। এই যুগে ভারতবর্ষ নিখিল মানব সমাজের সংস্পর্শ লাভ করিয়া, পুরাতন গিরি-গহ্বরের বাহিরে আসিয়া, মুগ্ধনেত্রে অগণ্য নূতন আদর্শের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই যুগে ভারতবর্ষ মুক্ত বাতায়ন পথে বাহিরের আলোক গ্রহণ করিয়া, ভিতরের আধ্যাত্মিকতাকে নূতন নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাতেই আধ্যাত্মিকতার সংগে মানবিকতার সমন্বয় সাধিত হইয়া গিয়াছিল।

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই মিলন যুগকেই ভারতশিল্পের আদি যুগ বলিয়া গ্রহণ করায়, অধ্যাপক হাভেল তাঁহাদিগকে "ভ্রান্ত" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহাকে অভ্যুদয়-যুগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকেই কেহ কেহ আদিযুগ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিলে, উপহাস করা শোভা পায় না। যে বৈদিক যুগকে অধ্যাপক হাভেল আদিযুগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে (তাঁহার মতে) বিকাশ ছিল না, ভাবুকতা ছিল; চিত্র ছিল না, ভাস্কর্য্য ছিল না, অভিব্যক্তি ছিল না; কিন্তু তাহার মূল প্রস্রবণরূপে আধ্যাত্মিক-ভাবুকতা বর্ত্তমান ছিল। বীজকে বৃক্ষ বলিতে অসম্মত হইলে কাহাকেও উপহাস করা শোভা পায় না;—এই ভাবুকতার যুগকেও শিল্পের আদিযুগ বলিতে অসম্মত হইলে, কাহাকেও উপহাস করা শোভা পায় না। কিন্তু ইহাকে সিদ্ধান্ত না বলিয়া বিতণ্ডা বলিলেই যুক্তি সংগত হইতে পারে। কারণ, উভয় মতের "সামান্য-লক্ষণ" একই প্রকার। উভয়েই মানিয়া লইয়াছেন, শাক্যবুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে শিল্প প্রতিভা চিত্রে বা

ভাস্কর্য্যে অভিব্যক্ত হয় নাই। এক পক্ষ বলিতেছেন,—অভিব্যক্তির যুগই শিল্পের আদিযুগ ; আর এক পক্ষ বলিতেছেন,—তাহার পূর্ব্বে যে ভাবুকতার যুগ বর্ত্তমান ছিল, তাহাই প্রকৃত পক্ষে আদি-যুগ। দুর্ভাগ্য ক্রমে, উভয় পক্ষই শাক্যবুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিবার জন্য শ্রমস্বীকার করিতে অসম্মত। তখনও শিল্প ছিল, অভিব্যক্তি ছিল ; তখনও আলোক ছিল, সভ্যতা ছিল ; বরং ব্রাহ্মণের আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের বাহুল্যই শিল্পকে বিকশিত করিবার জন্য তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিলে, ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ ক্রিয়াকাণ্ডের অবতারণা না করিলে, ভাব কর্ম্মে অভিব্যক্ত হইত না ;—আদর্শ শিল্পে পরিণত হইত না ;—অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত রূপ লাভ করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণ ক্রিয়াকাণ্ডের আতিশয্যে জন-সমাজকে ইহসর্ব্বস্ব সাংসারিকতা হইতে দূরে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিলে, শাক্য-বুদ্ধদেবের সাধন-লালসা বিকশিত হইতে পারিত না। ব্রাহ্মণ পথপ্রদর্শক না হইলে, অনির্ব্বচনীয়কে বাক্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, প্রতিমায়, অভিব্যক্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষ ব্যাকুল হইয়া উঠিত না। সুতরাং প্রচলিত পাশ্চাত্য মতে প্রবল স্রোতে ভাসমান হইয়া, গ্রন্থকার অজ্ঞাতসারে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের ন্যায়, তিনিও শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী যুগকেই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষের প্রথম শিল্প যুগ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমরা এখন কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব ? আমরা কি ইহাই বিশ্বাস করিব যে,—(১) বৈদিক যুগে ধারণা ছিল, অভিব্যক্তি ছিল না ?—আদর্শ ছিল, শিল্প ছিল না ? (২) আর্যসমাজকে সভয়ে সযত্নে আত্মসমাজের অভ্যন্তরে বাস করিতে হইত বলিয়া, অনার্য্য সংস্পর্শ পরিহার কামনায়, আর্য্যগণকে সুদীর্ঘ মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া, শিল্প প্রতিভা চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল ? (৩) ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে

গিয়া, নিয়ত বেদাধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিয়াও, তাহার দিব্যজ্যোতিকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন ? (৪) তাঁহারা ক্রিয়াকলাপের আতিশয্যে আত্মহারা হইয়া, শিল্প-শক্তিকে সহায় রূপে জাগাইয়া না তুলিয়া, তাহাকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন ? (৫) যে শাক্য-বুদ্ধদেব "সর্ব্বং অনিত্যং দুঃখ্যং" এই মূল মন্ত্র প্রচারে অনন্যকর্ম্মা হইয়াছিলেন, তিনিই কি ভারতবর্ষের ভাবের নিরুদ্ধ স্রোতকে কারামুক্ত করিয়া, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানবিকতাকে—সাংসারিকতাকে চিরসম্মিলিত করিয়া দিয়া, ভারত-শিল্পের জন্মদান করিয়াছিলেন ?

আমরা যদি এ সকল কথা নিঃসংশয়ে মানিয়া লইতে পারি, তবে অধ্যাপক হাভেলের সকল সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে পারিব। কিন্তু আমাদের পুরাতন সাহিত্য তাহার প্রবল অন্তরায় ; আমাদের শ্রীমূর্ত্তিনিচয়ে তাহার প্রবল অন্তরায়, আমাদের গুরুপরম্পরাগত শিক্ষা দীক্ষা তাহার প্রবল অন্তরায়।

একবার পাশ্চাত্য-সমাজে, গুরুপরম্পরাগত ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিয়া, বেদমন্ত্রার্থ অবগত হইবার চেষ্টা আবির্ভূত হইয়াছিল। আচার্য্য গোলডষ্টুকর তীব্র প্রতিবাদে সকলকে সাবধান করিয়া দিবার পর, আবার স্রোত ফিরিয়াছে ;—আবার গুরুপরম্পরাগত ভাষা ব্যাখ্যা অবলম্বন করিবার অধ্যয়ন রীতিই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এত কালের পর, শিল্প-তত্ত্বের অধ্যয়নে পুনরপি সেই উদ্দাম কল্পনা মুখর হইয়া উঠিতেছে ; স্বমত-সমর্থনের জন্য মনের মত ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়া, তাহার উপরে সিদ্ধান্ত সংস্থাপনের আয়োজন চলিতেছে। ইহাকেও আবার প্রকৃত পথে ফিরিয়া আসিতে হইবে। তবে,—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'

সূত্র-পরিচিতি

১. **The Ideals of Indian Art.**

২. **Convinced as I am that the learning of the Orientalist,**

however profound and scientific it may be, is often most misleading in aesthetic criticism, it has always been my first endeavour, in the interpretation of Indian ideal, to obtain a direct insight into the artist's meaning, without relying on modern archaeological conclusions and without searching for the clue which may be found in Indian literature,—Introduction.

৩. Hitherto archaeological excavations in India have been little more than a scraching of the superficial layers. When the sandy deserts of Rajputana and the lower starta of the alluvial deposits of the Indus and the ganges, and other sacred rivers, are explored as scientifically and systematically as the sand of Egypt and the soil of crete we may learn a great deal more of the indigenous Indian Art which preceded the Asokan period, —p. 18

8. But the Visions of the vedic seers only materialised to the wonderful sculpture and painting of the great period of Indian Art, before the Mahomedan invasion,—that is from the fourth of to the tenth centuries A. D,- when Vedic literature was first committed to writing.—P. 11.

৫. The spirituality of the Vedic age was gradually obscured for a time at least by the complicated ritualism of Brahmana Priesthood, and it was the teaching of Buddha which gave the next great impulse to the development of Indian art widening the intellectual out look and correlating the abstract ideas and spiritual vision of the vedic age with human conduct and the realities of life,—p. 18

যাঁহারা কংগ্রেস উপলক্ষে কলিকাতার শিল্প-প্রদর্শনীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহারা দেখিয়া আসিয়াছেন—এখনও ভারতীয় শিল্প-নৈপুণ্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। কোন কোন বিষয়ে অনন্যসাধারণ কলা নৈপুণ্যে বিলক্ষণ দেদীপ্যমান। তজ্জন্য আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আত্মশ্লাঘা প্রকাশে সক্ষম হইলেও, সে শ্লাঘা বড় অধিক দিন সম্ভোগ করিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না। সভ্য জগৎ নিত্য নূতন শিল্প-কৌশল আবিষ্কারে নিযুক্ত থাকিয়া নিরন্তর সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে; আমরা কেবল পশ্চাৎ হইতে আরও পশ্চাতে পিছাইয়া পড়িতেছি।

শিল্পের আদর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে; শিল্পীর সংখ্যাও দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছে। দেশের লোকে উৎসাহদানে কৃপণতা করিলে শিল্পের অধোগতি উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। সেই স্বাভাবিক নিয়মে ভারতীয় শিল্প-সম্ভার ক্রমে পূর্ব্ব-গৌরব ও পূর্ব্ব-সৌভাগ্য হারাইতে বসিয়াছে।

কলিকাতার মত ধনাঢ্য রাজধানীতে কিয়দ্দিবসের জন্য যে বিচিত্র শিল্প-সম্ভার সঙ্কলিত হইয়া লোক-লোচনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল,—লোকে অর্থব্যয় করিয়া ক্রয় করিবার জন্য যথাযোগ্য আগ্রহ প্রকাশ না করায় তাহার অধিকাংশ দ্রব্যই শূন্যগর্ভ সাধুবাদ ও ক্ষুদ্রকায় পুরস্কারপদক উপার্জ্জন করিয়া শিল্পীগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

দেশ বড় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর ব্যয়বাহুল্য করিয়া বহু-মূল্য শিল্প-দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব নহে,—ইত্যাদি কবি বোলের আবৃত্তি করিয়া কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করা কঠিন নহে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। অর্থ-দৈন্য অপেক্ষা রুচি-দৈন্যই অধিক পরিস্ফুট। তজ্জন্য দেশীয় শিল্পে অনাস্থা ও বিদেশের কাচখণ্ডে আসক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

ভারতীয় আচারব্যবহারের পার্থক্যবশতঃ যে সকল বিদেশের শিল্পদ্রব্যের কিছুমাত্র প্রয়োজন অনুভূত হইত না, এখন তাহা ব্যবহার করিবার জন্য আচার ব্যবহারও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ধনাঢ্যের গৃহসজ্জার মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশের কলানৈপুণ্য পুঞ্জীকৃত,—কেবল তাঁহার স্বদেশই সেখানে হতমান।

দেশে যে উপযুক্ত উপকরণের অভাব আছে; তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। তাহার প্রধান দোষ এই যে, তাহা বিলাতী নহে,—স্বদেশী। বিলাতী-মোহে জনসমাজ অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তজ্জন্য দেশীয় শিল্প বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

হর্ম্ম্যতল আচ্ছাদন করিবার জন্য বিলাতী "কার্পেট" ব্যবহৃত হইতেছে। অল্পদিন পূর্ব্বে বিলাতের লোকে "কার্পেট" চিনিত না; আমাদের ও পারস্যের আদর্শ লইয়াই তাহারা কার্পেট প্রস্তুত ও ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। কার্পেট শীতপ্রধান দেশের পক্ষে আবশ্যক; গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অনাবৃত হর্ম্ম্যতলই সমধিক সুখকর; মর্ম্মর খচিত হইলে আরও সুখকর। তথাপি যদি বিচিত্র চারুশিল্পে হর্ম্ম্যতল আচ্ছাদন করিতে হয়, তাহার নানা উপকরণ দেশে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। কুশ কাশ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার দ্বারা বর্ণ-সমাবেশ ও রচনা কৌশলে অতি উৎকৃষ্ট আস্তরণ প্রস্তুত হইতে পারে;—কাশ্মীরাঞ্চলে ইংরাজের কৃপায় এরূপ আস্তরণ অনেক প্রস্তুত হইতেছে। মাদুর কত সুন্দর, কত সূক্ষ্ম, কত বিচিত্র শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদানে সক্ষম, এবার মাদ্রাজী মাদুর তাহার সাক্ষ্যদান করিয়াছিল;—তাহা যেমন কোমল, তেমনি মসৃণ; ধনীর হর্ম্ম্যতল আচ্ছাদন করিবার পক্ষে সর্ব্বাংশেই সুন্দর। গালিচা, দুলিচা, কার্পেট, সতরঞ্চ এখনও পর্য্যাপ্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার প্রস্তুত কৌশলও নিতান্ত সহজ। শন, পাট, মেষলোম, তুলা ও রেশমের দ্বারা সাধারণ কার্পেট এবং জরি মিশাইয়া বহুমূল্য কার্পেট প্রস্তুত করিবার কৌশল লোকে এখনও বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু দেশীয় কার্পেটের আদর ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

দরবারে, বিবাহ-সভায় ও ধনীগৃহে যে বহুমূল্য কারুকার্য্য-খচিত "মসলন্দ" নামক আসন ব্যবহৃত হইত, তাহার আদর তিরোহিত হইতেছে; বিলাতী চেয়ার, সোফা ইত্যাদি সে স্থান অধিকার করিতেছে। যাহারা "মসলন্দ" প্রস্তুত করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত, তাহারা শিল্পচর্চ্চা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। ধনীগৃহে "মসলন্দের" ন্যায় বহুমূল্য বিলাতী আস্তরণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই সকল প্রয়োজন সাধনার্থ পুরাতন "মসলন্দ" ব্যবহৃত হইলে ক্ষতি কি? "মসলন্দের" ন্যায় সিংহাসনও এখন বিলাতী আকার ধারণ করিয়াছে। রাজারাজড়ার জন্য বিলাতী দোকানে বিলাতী আদর্শে সিংহাসননামধেয় চেয়ার প্রস্তুত হইতেছে; পুরাতন আদর্শের সিংহাসন এখন আর সমাদর লাভ করিতেছে না।

এ সকল ধনাঢ্যের ব্যবহার্য্য শিল্পদ্রব্য। জনসাধারণের ব্যবহার্য্য শিল্পদ্রব্যও যথেষ্ট আছে; কিন্তু ক্রমে তাহাও বিলুপ্ত হইতেছে। বিলাতী রুচি জনসাধারণকেও আক্রমণ করিয়াছে। তাহারাও ফরাস ছাড়িয়া টেবিল চেয়ার ধরিতেছে; মোড়া ছাড়িয়া আরাম-চৌকি খুঁজিতেছে; হাত-পাখা ভুলিয়া টানা-পাখা ঝুলিতেছে; ধুতি চাদর শাল বনাত ফেলিয়া হ্যাটকোট ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে! তজ্জন্য দেশীয় তন্তুশিল্পের অবনতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ভাল ধুতি, ভাল শাল রুমাল জামিয়ার ক্রমে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে; তৎসঙ্গে ভারতীয় শিল্পের একাংশ নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে! ভারতীয় তাঁতের সূক্ষ্মশিল্প ও সূচির সূক্ষ্ম-শিল্প ইতিহাস বিখ্যাত;—ক্রমে তাহা ক্রমেই খ্যাতিহীন হইতেছে।

শিল্পদ্রব্য উৎপাদন প্রণালী দ্বিধাবিভক্ত;—গৃহজাত ও কারখানাজাত *দ্বিবিধ দ্রব্য দ্বিবিধ উৎপাদন প্রণালীর পরিচয় প্রদান করে।* বহু লোকের সমবেত শক্তিতে কল কারখানার সহায়তায় যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে কারখানাজাত শিল্পদ্রব্য বলা হয়। ইহাতে পর্য্যাপ্ত মূলধন আবশ্যক। গৃহজাত শিল্পদ্রব্য সেরূপ নহে। একজন বা এক পরিবার-ভুক্ত অল্পসংখ্যক লোকে সামান্য মূলধন লইয়া সংসারের দশ কাজের সঙ্গে

সংগে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। ভারতীয় শিল্পদ্রব্য এই উপায়েই উৎপাদিত হইত। প্রায় প্রতি গ্রামে, প্রতি গৃহে লোকে কোন না কোন শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অর্থোপার্জন করিত। অদ্যাপি যে সকল শিল্পদ্রব্যের জন্য ভারতবর্ষ বিশ্ববিখ্যাত, তাহাও এই প্রণালীতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এরূপ উৎপাদন প্রণালীর কতকগুলি অসুবিধা আছে। শিল্পী গৃহকোটরে আবদ্ধ থাকিয়া নূতন আদর্শ-সংগ্রহ করিতে পারে না, সভ্য জগতের রুচিপরিবর্ত্তনের সংগে কত নূতন ফ্যাসানের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হয় না ; কালে তাহার পুরাতন ফ্যাসানের বস্তু আর কাটিতেছে না কেন—তাহা বুঝিতে না পারিয়া শিল্পালোচনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহাদিগকে যৎসামান্য উপদেশ দিতে পারিলে নূতন রুচির উপযোগী শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতে বিশেষ অসুবিধা না হইতেও পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে ধাতুনির্ম্মিত পাত্রাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধাতুনির্ম্মিত পাত্রনির্ম্মাণে ভারতবর্ষ নানা শিল্পকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, পিত্তল প্রভৃতি ধাতু সংযোগে ভারতবর্ষে নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইত। এই সকল দ্রব্যে চিত্রকার্য্য, খোদাই ও ঢালাইকার্য্য সংযুক্ত হইয়া দ্রব্যগুলি মনোজ্ঞ করিয়া তুলিত। রুচিভেদে সে সকল দ্রব্য এখন আর ব্যবহৃত হয় না। এখন থালির স্থলে প্লেট, রেকাবির স্থলে পিরিচ, বাটীর স্থলে পেয়ালা, ভৃংগারের স্থলে ডিক্যান্টর, পুষ্পপাত্রের স্থলে ফুলদানী, প্রদীপের স্থলে সমাদান, পানবাটার স্থলে মাখনদান, চন্দনাধারের স্থলে নিমকদান, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু দ্রব্য প্রচলিত হইয়া বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইতেছে। ইহার সকল দ্রব্যই ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতে পারে। কেবল পুরাতন শিল্পিগণকে নূতন ফ্যাসানের উপদেশ দিবার লোকের অভাবে তাহারা এ কালের উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইতেছে না। যেখানে এরূপ উপদেশ পাইয়াছে, সেখানে পিত্তলাদি দ্বারা ভারতীয় শিল্পী কিরূপ উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতেছে, তাহা কলিকাতার প্রদর্শনীতে অনেকেই

প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন।

শিল্পসংক্রান্ত তর্কবিতর্ক দূরে রাখিয়া অতি সহজ উপায়ে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করা সম্ভব। শিল্পোন্নতির কারণপরম্পরার মধ্যে ক্রেতা সংগ্রহ করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। যদি ক্রেতা না থাকে, তবে সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়া যায়। ভারতবর্ষ বহুকোটী নরনারীর আবাসভূমি বলিয়া সভ্যজগতে ইহাকে ক্রেতার দেশে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা যাহা ক্রয় করি, তাহাতে পৃথিবীর বহু দেশের শিল্পী বাঁচিয়া যায়। দরিদ্র হইলেও আমরাই বহু ধনাঢ্য দেশের অন্নদাতা।

কি চাও? যদি ধনী হও, প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের একটি তালিকা করিয়া দেখ, তাহার সকল দ্রব্যই দেশে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। তুমি বিদেশ হইতে সে সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়াছ কেন? বিদেশের দ্রব্যে একটা চাকচিক্য আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু তাহা স্থায়ী বলিয়া বোধ হয় না। বিদেশের শিল্প-রুচি ভারতীয় শিল্পরুচির সমকক্ষ নহে, তাহা যেন কঠিন, কর্কশ—আড়ম্বরময়। ভারতীয় শিল্পদ্রব্যে গৃহসজ্জা সম্পাদন করিয়া তাহার সহিত বিলাতী গৃহসজ্জার তুলনা না করিলে সে পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। ধনকুবেরগণ দেশের নানা স্থানে স্বদেশীয় গৃহসজ্জা ব্যবহার করিলে রুচিবিকার দূর হইতে পারে। ধনাঢ্য আমেরিকা ও জাম্মাণি অদ্যাপি পাঞ্জাব হইতে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিতেছে;—ভারতবর্ষ সে সকল দ্রব্যের সমাদর করে না কেন?

বিলাতী দ্রব্য বড় সস্তা,—এই ধুয়া ধরিয়া দরিদ্র লোকে বিলাতী দ্রব্যের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিলাতী দ্রব্য সস্তা বলিয়া বোধ হয় না। আপাততঃ দেখিতে গেলে এক জোড়া দেশী ধুতির মূল্যে হয়ত দুই জোড়া বিলাতী ধুতী ক্রয় করা সম্ভব; কিন্তু মোটের উপর বৎসরে বিলাতী কাপড়ে বেশী টাকা খরচ করিতে হয়। এক বৎসরের শীতবস্ত্র অন্য বৎসর ব্যবহার করা যায় না; বরং জ্বলিয়া যায়, ধোলাই করিলে সৌন্দর্য্য একেবারে বিনষ্ট হয়।

কলিকাতার প্রদর্শনীতে আর কোন ফল না হউক,—ভারতীয় শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় শিল্পের এখনও আশা আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। এখনও দেশের লোকে দেশের দ্রব্যে অনুরাগী হইলে, ভারতীয় শিল্প রক্ষা পাইতে পারে। ভারতীয় শিল্পে দুই শ্রেণীর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। নূতন উদ্ভাবনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে; যাহারা এই কার্য্যে অগ্রসর, তাহারা উপযুক্ত উৎসাহ লাভ করিলে বিলাতী কলকারখানার সহায়তায় অনেক দ্রব্য দেশেই উৎপাদন করিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করা যায়। পুরাতনের সংস্কার আরব্ধ হইয়াছে। যাহারা তাহাতে অগ্রসর, তাহারা উপযুক্ত উপদেশ পাইলে পুরাতন প্রণালীতেই অনেক অভিনব প্রয়োজন সাধনোপযোগী দ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে।

সভ্যজগতের শিল্পোন্নতির ইতিহাস নানা বিচিত্র কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সুশিক্ষিত লোকে শিল্পোন্নতির জন্য অগ্রসর না হইলে নিরক্ষর শ্রমজীবিগণ কদাচ উন্নতিসাধনে সক্ষম হইত না। সকল দেশেই শিল্পোন্নতির মূলে শিক্ষিত সমাজের চেষ্টা দেদীপ্যমান। ভারতবর্ষের শিল্প এখনও কেবল নিরক্ষর লোকের চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। তাহারা যে সভ্য-জগতের সহিত শিল্প-সংগ্রামে ক্রমে পরাভূত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? শিল্পোন্নতি সাধন করিতে হইলে নানাবিধ পরীক্ষা করা আবশ্যক। শিল্পী দরিদ্র—সে পরীক্ষা করিয়া সময় নষ্ট করিতে পারে না। শিক্ষিত লোকে পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষালব্ধ নূতন তথ্য শ্রমজীবীকে শিখাইয়া না দিলে শিল্পোন্নতি সাধিত হইতে পারে না। এদেশের শিক্ষা-প্রণালী যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রমজীবীদিগের সহায়তা সাধন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

কলিকাতা শিল্পপ্রদর্শনীর স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও অনেকে শিল্পোন্নতি সাধনের প্রকৃত পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য নানাবিধ আলোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এ সময়ে দেশের লোকের

সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে প্রকৃত পন্থা আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। সাধ্যমত স্বদেশের বস্তু ব্যবহার করিব,—এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত না হইলে ফল হইবে না।

বহু যুগের অবসাদগ্রস্ত আধুনিক বাঙ্গালী শিল্প-সাধকের অনভ্যস্ত হস্ত চিত্রচর্চ্চায় ব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া, রেখা এবং লেখা সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার তরুণ তারল্য, অনেকের নিকট তুচ্ছ হইলেও, স্বচ্ছ ;—স্খলন-পতন, কোন কোন স্থলে কিছু কিঞ্চিৎ অশোভন হইলেও, ভাববিহ্বল। এখনও তাহার সমালোচনার সময় উপস্থিত হয় নাই। কারণ, এখন তাহার লালন-কাল ;—তাড়ন-কাল এখনও বহু দূরে অবস্থিত। বোধ হয়, এই কারণেই অনেক চিত্র-রসজ্ঞ সুবিজ্ঞ পত্রিকা-সম্পাদক যে কোনও রচনা পত্রস্থ করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন ; এবং রেখাই হউক আর লেখাই হউক, অবলীলাক্রমে অনধিকারচর্চ্চার প্রশ্রয় লাভ করিতেছে। কালে ইহা হইতে একটি চিত্র-সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিলে, বর্ত্তমান রচনা-প্রয়াস সর্ব্বাংশে ব্যর্থ হইবে না। ব্যর্থ চেষ্টাই চেষ্টা সাফল্যের পূর্ব্ব-সূচনা।

অল্পদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর শিক্ষা-সাফল্যের পরিচয় প্রদান করিবার সময় বাঙ্গালী কবি "চতুঃষষ্টিকলার" উল্লেখ করিতেন। প্রমাণ—"কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।" সে প্রথা ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটি কলারও বিকাশ লাভের অবসর নাই। কেন এমন হইল, তাহার ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং তাহারও সমালোচনার সময় উপস্থিত হয় নাই। সে ভার ভবিষ্যতের যোগ্যতর হস্তে ন্যস্ত করিয়া, এখন কেবল যৎকিঞ্চিৎ অতীত চর্চ্চার আয়োজন করা যাইতে পারে। তাহার সময় এবং প্রয়োজন তুল্যভাবেই উপস্থিত হইয়াছে।

ভারত-চিত্র সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয় হইলেও, সর্ব্বাংশে যথাযোগ্য তথ্যানুসন্ধানের পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেছে না। তজ্জন্য অনেক বিষয়ে অনেক ভিত্তিহীন অনুমান অনুকূল কল্পনাপ্রবাহে বিচার-নিষ্ঠা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার গতি-সংযমের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

ভারত-চিত্রের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হইয়া না উঠিলে, আমাদের বর্ত্তমান চিত্র-চর্চ্চা ভারত-চিত্র নামে কথিত হইবার পক্ষে কতদূর যোগ্য হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে না। ভারতবর্ষে বসিয়া চিত্র-চর্চ্চা করিলে, ভারত-চিত্র হইবে না। ভারতবর্ষীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া চিত্র-চর্চ্চা করিলেও ভারত-চিত্র হইবে না। ভারতচিত্রের প্রকৃতিগত অনন্যসাধারণ বিশিষ্ট লক্ষণই প্রকৃত মান-দণ্ড। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, চিত্র-চর্চ্চা করা অসম্ভব নহে ; কিন্তু তাহাকে ভারত-চিত্র বলা অসংগত। তাহাকে ভারত-চিত্র বলিতে হইলে, সংগে সংগে ইহাও বলিতে হইবে,—তাহা বিশুদ্ধ নহে, সঙ্কর। তাহা আভিজাত্যহীন আধুনিক অভ্যুদয়,—অতীত-শৃঙ্খলমুক্ত নবাভিব্যক্ত রচনা-বিলাস। নবাগত বলিয়া তাহা স্বাগত সম্ভাষণ লাভের অনধিকারী না হইলেও, ভারত-চিত্র নামে সমাদর লাভের অধিকারী কিনা, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই। কারণ, রীতি-বিরুদ্ধ কলালাপ সুন্দর হইলেও, সহসা মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না। তাহাকে দিনে দিনে যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া, মর্য্যাদা লাভ করিতে হয়। তাহা যে পরিমাণে কৌলিন্য-হীন, তাহাকে সেই পরিমাণ তারস্বরে বলিতে হয়,—

"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং তু পৌরুষম্"

কিন্তু ভারত-চিত্র নামে পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, ভারত-চিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণের অনুগত হইয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। ত্যাগ বা গ্রহণ,—যে পথই অবলম্বিত হউক না কেন,—ভারত-চিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ কিরূপ ছিল, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক ; নিদর্শনের অভাবে, তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অধিক অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের রচনা-চেষ্টা সে পথে এখনও অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। অজ্ঞের নিন্দা-প্রশংসা তুল্যরূপে মূল্যহীন। ভারত-চিত্র-চর্চ্চার আধুনিক চেষ্টা দেশের লোকের নিকট এখনও তাহার অধিক

আর কিছু লাভ করিতে পারে নাই। বিদেশের লোকের নিকট যাহা লাভ করিতেছে, তাহা—কৃপা-কটাক্ষ! সে কটাক্ষে কুটিলতা না থাকিলেও, কমনীয়তা বড় সুসংযত।

"যথা সুমেরুঃ প্রবরো নগানাং যথাণ্ডজানাং গরুড়ঃ প্রধানঃ।
যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশ স্তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ॥"

পর্ব্বতমালার মধ্যে সুমেরু যেমন সর্ব্বলোকবরেণ্য;—অণ্ডজাত জীবগণের মধ্যে গরুড় যেমন সর্ব্বপ্রধান;—নরগণের মধ্যে রাজা যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ;—কলাসমূহের মধ্যে চিত্রকল্পও সেইরূপ।

এই বর্ণনা পাঠ করিলে, বুঝিতে পারা যায়,—পুরাতন ভারতবর্ষে চিত্র কত উচ্চ সমাদর লাভ করিয়াছিল। কেন করিয়াছিল,—নিদর্শনের অভাবে এখন আর তাহার পরিচয় লাভের উপায় নাই। এখন সাহিত্য-নিহিত বর্ণনা, এবং ইতিহাস-বর্ণিত ঘটনা একমাত্র তথ্যানুসন্ধানের উপায়।

যাহা ছিল, তাহা নাই। যাহা আছে,—সেই অজন্তাগুহা-চিত্রাবলী,—তাহা এখন পাশ্চাত্য সমাজে সমাদর লাভ করায়, তাহাই বিলুপ্ত ভারত-চিত্রের একমাত্র উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে; এবং ধীরে—অতি ধীরে—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে,—তাহাই আধুনিক চিত্র-চর্চ্চায় প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তাহাতে যাহা আছে, তাহা কিন্তু চিত্র নহে,—চিত্রাভাস। তাহা পুরাতন ভারত-চিত্রের অসম্যক্ নিদর্শন;—চিত্র—সাহিত্য—দর্পণের "দোষপরিচ্ছেদের" অনায়াসলভ্য উদাহরণ। তাহা কেবল বিলাস-ব্যসনমুক্ত যোগযুক্ত অনাসক্ত সন্নাসী-সম্প্রদায়ের নিভৃত-নিবাসের ভিত্তি-বিলেপন;—বিচক্ষণ চিত্র-সমালোচকগণের নিকট ভক্তি-ভারাবনত নমস্কার লাভের যোগ্য হইলেও, ভারত-চিত্রোচিত প্রশংসা লাভের অনুপযুক্ত। তাহা এক শ্রেণীর "পুস্ত-কর্ম্ম",—তাহার মূল প্রয়োজন অলঙ্করণ। সে প্রয়োজন ভক্তচিত্তকে ঈপ্সিত ভাবের অনুরক্ত করিতে পারিলেই, কৃতকৃতার্থ। তাহাতে যাহা কিছু চিত্র-গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অযত্ন—সম্ভূত,—আকস্মিক,—অলৌকিক। এক সময়ে

সকল গৃহেই এইরূপ ভিত্তি-চিত্রের ব্যবস্থা ছিল, কিরূপ গৃহে কোন্ শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত হইবে, তাহাও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সকল ভিত্তি চিত্রে কেহ চিত্র-সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা দর্শনের আশা করিত না; ভিত্তি-গাত্র সেরূপ প্রতিভা-প্রকাশের উপযুক্ত স্থান বলিয়াও পরিচিত ছিল না।

"স্থানং প্রমাণং ভূলম্ভো মধুরত্বং বিভক্ততা।
সাদৃশ্যং ক্ষয়বৃদ্ধী চ গুণাষ্টকমিদং স্মৃতম্।
স্থান-হীনং গতরসং শূন্যদৃষ্টিমলীমসং।
চেতনা-রহিতং বা স্যাৎ তদশস্তং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

স্থান-প্রমাণ-ভুলম্ভ-মধুরত্ব-বিভক্ততা-সাদৃশ্য-ক্ষয়-বৃদ্ধি,—এই আটটি পারিভাষিক সংজ্ঞায় চিত্রের আটটি গুণ উল্লিখিত। স্থান-দোষ, রস-দোষ, চিত্র-দোষ; এই সকল দোষদুষ্ট চিত্র অপ্রশস্ত বলিয়া লিখিত। এই সকল চিত্র-গুণের এবং চিত্র-দোষের যথাযথ পর্য্যবেক্ষণে যাঁহাদের চক্ষু অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট অজন্তাগুহা-চিত্রাবলী ভারত-চিত্রের অনিন্দ্যসুন্দর নিদর্শন বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিতে অসমর্থ। যাঁহাদের তুলিকাসম্পাতে এই সকল ভিত্তিচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাঁহারা পুরাতন ভারতবর্ষে "চিত্রবিৎ" বলিয়া কথিত হইতে পারিতেন না। তাঁহারা নমস্য; কিন্তু চিত্রে নহে, চরিত্রে। তাঁহাদের ভিত্তিচিত্রও প্রশংসার্হ; কিন্তু কলা-লালিত্যে নহে, বিষয়-মাহাত্ম্যে।

চিত্রবিৎ কে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য সেকালের শাস্ত্রকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন,—সমীরণ সঞ্চরণে, জলে তরঙ্গ উত্থিত হয়; অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া শিখা বিকাশ করিয়া থাকে, ধূম গগনমণ্ডলে আরোহন করে; পতাকা আকাশে অঙ্গ বিস্তার করে। যিনি এই সকল গতি-ভঙ্গী যথাযথ-ভাবে চিত্রিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চিত্রবিৎ। সুপ্ত হইলে, মনুষ্যের প্রাণস্পন্দনের চেতনা লুপ্ত হয় না, মৃত হইলেই সে চেতনা লুপ্ত হইয়া যায়;—দেহের সকল অংশ সমান নহে, কোনও অংশ উন্নত, কোনও অংশ অবনত। যিনি এই সকলের পার্থক্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চিত্রবিৎ।

যথা,—

"তরঙ্গাগ্নিশিখাধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকং
বায়ুগত্যা লিখেৎ যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ ॥
সুপ্তঞ্চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতং।
নিম্নোন্নত-বিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ ॥"

ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—কেবল আকারাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত হইলেই, কেহ চিত্রবিৎ বলিয়া মর্য্যাদালাভ করিতে পারিতেন না।

অ-জীবের গতি-ভঙ্গী চিত্রিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু সজীবের স্থিতি-ভঙ্গী চিত্রিত করাও কঠিন। তাহাতে চেতনা-ব্যঞ্জক শিল্প-কৌশল আবশ্যক। সেই চেতনায় মৃতের সঙ্গে জীবিতের পার্থক্য প্রকটিত হয়। তাহাকে আবার এমন ভাবে চিত্রিত করা আবশ্যক যে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যায়,—যেন স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। সেইরূপ চিত্রই চিত্র,—তাহাই শুভলক্ষণ সংযুক্ত। যথা,—

"সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভ লক্ষণম্।"

বিষয়-ভেদে, পদ্ধতি-ভেদে, প্রয়োজন ভেদে, ভারত-চিত্রে অনেকগুলি বিভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। তথাপি পুরাতন সাহিত্যে চিত্রের মুখ্য প্রতিশব্দ—"আলেখ্য", এবং আলেখ্যের প্রধান বিষয় নায়ক-নায়িকা। বাৎস্যায়ন তাহাকেই মুখ্য ভাবে সূচিত করিয়া গিয়াছেন। টীকাকার যশোধর, তাহাকে বিশদ করিবার জন্য, একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"রূপভেদাঃ প্রমাণাণি ভাব-লাবণ্য-যোজনং।
সাদৃশ্যং বর্ণিকা-ভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।"

যশোধর প্রমাণরূপে এই কারিকার উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন; ইহার ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস স্বীকার করেন নাই। ইহাতে বড় অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, অনেকে অনেক কল্পনা-জল্পনার অবতারণা করিতেছেন। নব্য-বঙ্গের

শিল্পাচার্য্য (ঠাকুর) ইহাকে "চিত্রের ষড়ঙ্গ" নাম দিয়া, সুদূর জার্ম্মাণ দেশের একখানি পত্রিকায়, ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া, আলোচনার সূত্রপাত করেন। ভারত-চিত্র সম্বন্ধে পুস্তিকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, কলিকাতা শিল্প শিক্ষালয়ের প্রধান আচার্য্য পারসী ব্রাউন্, শিল্পাচার্য্য ঠাকুরের দোহাই দিয়া,—এই কারিকাকে বাৎস্যায়ন কর্ত্তৃক "কামশাস্ত্রে" উদ্ধৃত বলিয়া, ইহার একটি বিচিত্র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।[১] ভারত-শিল্প-সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সে সাহিত্যের পারিভাষিক সংজ্ঞা অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। কোষগ্রন্থের সাহায্যে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইবার উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় পারিভাষিক সংজ্ঞা-পূর্ণ পুরাতন কারিকার ইংরাজী অনুবাদের চেষ্টা যে সফল হয় নাই, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এই কারিকায় এমন অনেক কথা দ্যোতিত হইয়াছে, যাহা ইংরাজী ভাষায় সুব্যক্ত হইতে পারে না।

ইংরাজী অনুবাদটি ঠাকুর-কৃত বলিয়া উল্লিখিত। বাৎস্যায়নের আবির্ভাব-কালের কথা, এবং বাৎস্যায়ন কর্ত্তৃক "কাম-শাস্ত্রে" এই কারিকা উদ্ধৃত হইবার কথা, কাহার কথা, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সকল কথাই অবলীলাক্রমে লিখিত হইবার অভ্যাস যে ভাবে প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহাতে এরূপ ঐতিহাসিক উক্তি বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে না।

এই কারিকায় চিত্র "ষড়ঙ্গক" বলিয়া উল্লিখিত। তাহাকে "চিত্রের ষড়ঙ্গ" বলিয়া উল্লিখিত অনুবাদ করায়,কিঞ্চিৎ গোলযোগ সংঘটিত হইয়াছে। ভারত-চিত্র "ষড়ঙ্গক", সুতরাং যে চিত্রে ছয়টি অঙ্গই বর্ত্তমান নাই, তাহা অঙ্গহীন; চিত্র নহে,—চিত্রাভাস। অঙ্গগুলির বিশেষ আলোচনা আবশ্যক; অনুবাদে সে প্রয়োজন সর্ব্বথা সিদ্ধ হইতে পারে না।

প্রথম অংগ—রূপভেদ

ইহা "দৃশ্যজ্ঞান" নামে অনূদিত হইয়াছে। ইহা "জ্ঞান" নহে, "কর্ম"; এবং "দৃশ্য" অপেক্ষা "অ-দৃশ্যের" সহিত সেই কর্মের নিকটতর সম্বন্ধ। কর্মটি "ভেদ"-সাধন। তাহা "রূপের" ভেদ-সাধন। সুতরাং "রূপ" কি তাহা জানা আবশ্যক। তাহা একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা। প্রত্যেক অংগ-প্রত্যংগ এক একটি "রূপের" আধার। চিত্রে একটি রূপ হইতে আর একটি রূপকে পৃথক করিয়া দেখাইবার নাম "রূপ-ভেদ।" তাহা চিত্রগুণ-কীর্ত্তনে "বিভক্ততা" বলিয়া উল্লিখিত। ইহা সাধারণ ভাবে "রেখা-বিন্যাস" বলিয়া কথিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে "রূপ-ভেদের" পদ্ধতি সূচিত হইলেও, "রূপের" অর্থ সুব্যক্ত হয় না। যাহার প্রভাবে অংগ-প্রত্যংগ কোনরূপ ভুষণ-ভূষিত না হইয়াও, বিভুষিতবৎ প্রতিভাত হয়, তাহারই নাম "রূপ।" যথা,—

"অংগান্যভূসিতান্যেব কেনচিদ্ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ভাতি তৎ রূপমিতি কথ্যতে।"

"রূপ" রূপ নহে;—অ-রূপ। তাহা অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে ব্যক্ত হয়। যাহা প্রকৃত পক্ষে অনুভূতিগম্য এবং অতীন্দ্রিয়, তাহা এইরূপে দৃষ্টিগম্য হইয়া থাকে। তজ্জন্য ভারত-চিত্রে "রেখা" রেখা নহে; তাহা "রূপ-রেখা।" তাহার বিশুদ্ধি রক্ষার উপর চিত্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে। চিত্রের ভিন্ন-ভিন্ন অভিব্যক্তি ভিন্ন-ভিন্ন রুচিসম্পন্ন দর্শকের চিত্ত বিনোদন করে। আচার্য্যগণ "রেখার" প্রশংসা করিয়া থাকেন;—বিচক্ষণগণ (আলো ও ছায়া প্রদর্শক) "বর্ত্তনার" প্রশংসা করেন;—রমণীগণ ভূষণ-বিন্যাসের অনুরাগিণী;—ইতর জন "বর্ণাঢ্যতার" পক্ষপাতী। যথা,—

"রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ॥"

"রূপ-ভেদ" প্রথম কার্য্য। তাহার পদ্ধতি শিল্প শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। একটি "অনুলোম" এবং আর একটি "প্রতিলোম" পদ্ধতি।

মস্তক হইতে রেখা-বিন্যাসের নাম "অনুলোম-পদ্ধতি", পদযুগল হইতে রেখা-বিন্যাসের নাম "প্রতিলোম-পদ্ধতি।" দেবমূর্ত্তির চিত্রাঙ্কনে "অনুলোম পদ্ধতিই" অবলম্বনীয়। শরীরের সকল অংগকেই রূপ-ভেদে প্রদর্শিত করিতে হয় না, কারণ সকল অংগ রূপের আধার নহে। যে সকল অংগ রূপের আধার, তাহা পৃথক্‌ভাবে প্রদর্শিত না হইলে, "চিত্র-দোষ" সংঘটিত হয়। "অবিভক্ততা" সেই সুপরিচিত "চিত্র-দোষ।" এই কারণে ভারত-চিত্রে কোন কোন অংগ ইংগিত মাত্রে ব্যক্ত, কিন্তু কোন কোন অংগ সুনির্দ্দিষ্ট রেখা-বিন্যাসে সুবিভক্ত। ভারত-চিত্রের এই "রূপভেদ"-রীতির যথাযোগ্য বিচারের অভাবে, কোন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থে ভারত-চিত্র "রেখাত্মক" বলিয়া উল্লিখিত। ভারত-চিত্র "রেখাত্মক" নহে,—"রূপাত্মক।"

দ্বিতীয় অংগ—প্রমাণ

তালহীন সংগীতের ন্যায় মান-হীন চিত্র রস-বোধের অন্তরায়। অংগ-প্রত্যংগের মধ্যে একটি পরিমাণ পার্থক্য বর্ত্তমান। দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মভাবে অংগ-প্রত্যংগের স্থিতি সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, গতি-বিধানের সহায়তা সাধন করে। ইহা বিশুদ্ধানুভূতি, পরিমাণ, এবং গঠন বলিয়া অনূদিত হইয়াছে। ইহা প্রকৃত পক্ষে রেখা-বিন্যাসকে সুসংযত করিয়া, চিত্র-সৌন্দর্য্য বিকাশিত করে। ইহা অনাবশ্যক শাসন-শৃংখল নহে। ইহাকে অবহেলা করিবার উপায় নাই। কেবল এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ;—তাহা হাস্যরসের অবতারণায় অভিব্যক্ত। কিন্তু সেখানেও সাধারণ পরিমাণের ব্যতিক্রম ঘটিলেও, রসানুগত পরিমাণ অনতিক্রমনীয়। "প্রমাণ" সীমাকে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া, চিত্রকে সুসংগত করে। ইহাতে শিল্পের সেচ্ছাচার সংযমিত হয় ; —তাহার প্রতিভা-প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না।

তৃতীয় অংগ—ভাব

ইহা আকারের উপর মনোবৃত্তির ক্রিয়া বলিয়া অনূদিত হইয়াছে। ভাব "ক্রিয়া" নহে; অশরীরী চিত্ত-বৃত্তি;—তাহা বিভাব-জনিত শরীরেন্দ্রিয়-বর্গের বিকার-বিধায়ক চিত্তবৃত্তি। যথা,—

"শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কাঃ।
ভাবা বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ॥"

পৃথক্ পৃথক্ ভাবের প্রভাবে শরীরেন্দ্রিয়বর্গের পৃথক্ পৃথক্ বিকার সাধিত হয়। ইহা লোকসমাজে নিত্য প্রত্যক্ষীভূত। মানব-চিত্তবৃত্তি রসানুগত; তদনুসারে "ভাব" নিয়মিত হইয়া থাকে। চক্ষুর আকার পার্থক্যে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"চাপাকারং ভবেন্নেত্রং মৎস্যোদরমথাপিবা।
নেত্রমুৎপলপত্রাভং পদ্মপত্রনিভং তথা।
শশাকৃতির্মহারাজ! পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

চক্ষুর আকার পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত;—চাপাকার, মৎস্যোদর, উৎপলপত্রাভ, পদ্মপত্রনিভ, এবং শশাকৃতি। চাপাকারের অর্থ—ধনুরাকৃতি। তিব্বতীয় বুদ্ধমূর্ত্তিতে এবং কোন কোন বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তিতে এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট চক্ষু লক্ষ্য করিয়া ওয়াডেল্ তাহাকে কিউপিডের ধনুর তুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। নেত্রের এরূপ আকারের কারণ কি, তাহার তথ্যানুসন্ধান না করিয়া, তিনি ইহাকে "স্বপ্নাবেশ" বলিয়া উপহাস করিয়া গিয়াছেন। নেত্রের অন্যান্য আকারগুলিও এইভাবে অবিচারে উপেক্ষিত হইতেছে।[২]

চক্ষু একটি সুপরিচিত শরীরেন্দ্রিয়; ভাবের প্রভাবে তাহার বিকার সাধিত হইয়া থাকে; এবং তদনুসারে তাহার আকার পরিবর্ত্তিত হয়। এই কারণে, সকল অবস্থায় সকল নরনারীর চক্ষুর আকার একরূপ হইতে পারে না। চিত্র সূত্রোক্ত পাঁচ প্রকারের চক্ষু পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন আকার সূচিত করে; এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রভাবে সেই সকল আকার-পার্থক্য সংঘটিত

হইয়া থাকে। যথা,—

"চাপাকারং ভবেন্নেত্রং যোগভূমি-নিরীক্ষণাৎ।
মৎস্যোদরাকৃতিং কার্য্যং নারীণাং কামিনাং তথা ॥
নেত্রমুৎপলপত্রাভং নির্ব্বিকারস্য শষ্যতে
ত্রস্তস্য রুদতশ্চৈব পদ্মপত্রনিভং ভবেৎ ॥
ক্রুদ্ধস্য বেদনার্ত্তস্য নেত্রং শশাকৃতির্ভবেৎ ॥"

যোগ-ভূমি নিরীক্ষণের অভ্যাসে নেত্র ধনুরাকৃতি লাভ করে,—কামিজনের এবং কামিনীগণের নেত্র (লালসাপূর্ণ বলিয়া) মৎস্যোদরাকৃতি ;—নির্ব্বিকারচিত্তের নেত্ত উৎপলদল-সদৃশ ;—যে ত্রস্ত বা রুদ্যমান, তাহার নেত্র পদ্মদলের ন্যায় ; ক্রুদ্ধের এবং বেদনাগ্রস্তের নেত্র শশকাকৃতি শরীরেন্দ্রিয়-বর্গের এইরূপ বিকার-বিধায়ক চিত্তবৃত্তির নাম "ভাব", তাহা চিত্রের পক্ষে অপরিহার্য্য ; তাহার অভাব চিত্র-দোষ।

চতুর্থ অংগ—লাবণ্য-যোজন

ইহা "সৌন্দর্য্য-সন্নিবেশ" তথা "সুকুমার-প্রদর্শন-ক্রিয়া" বলিয়া অনূদিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা এরূপ সাধারণভাবে ব্যাখ্যাত হইলে, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম সকলের পক্ষে বোধগম্য হইতে পারে না। ইহা এক শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্যসাধন। "লাবণ্য"—শব্দের ব্যবহারে তাহা সুস্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। মুক্তা হইতে যেমন একটি তরঙ্গায়মান দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে, অংগ-প্রত্যংগ হইতে সেইরূপ তরংগায়মান দ্যুতি নিষ্কাষণের নাম "লাবণ্য"-যোজন। "লাবণ্য" একটি পারিভাষিক শব্দ। যথা,—

মুক্তাফলেষু ছায়ায়া স্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদংগেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে ॥"

সকল নরনারীর সকল অংগ-প্রত্যংগ হইতেই অল্পাধিক মাত্রায় একটি তরঙ্গায়িত দ্যুতি ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইহাই জীবিতকে মৃত হইতে পৃথক্ করিয়া দেখায়। ইহাকে চিত্রে প্রকাশিত

করিবার শিল্প-কৌশলের নাম "লাবণ্য-যোজন।" ইহাতে তরলতা আছে। তাহা "ছায়ার" অর্থাৎ "কান্তির" তরলতা। টীকাকারগণ তাহাকে "তরংগায়মান" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। "লাবণ্য" অংগ-প্রত্যংগের উপর দিয়া ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া যায়। সুতরাং তাহা কেবল ঔজ্জ্বল্য নহে,—চলোর্ম্মিবৎ চলোন্মুখ। তাহাতেই চিত্র নিজ্জীব হইয়াও, সজীববৎ প্রতিভাত হয়। স্থিতি-ভংগীর মধ্যে এইরূপ লাবণ্য-গতিভংগী সঞ্চারিত না হইলে, চিত্র "দৌর্ব্বল্য-দোষের" জন্য নিন্দিত হইয়া থাকে। "অবিভক্ততা" অর্থাৎ "রূপ-ভেদের" অভাব একটি চিত্র-দোষ; যে রেখা-বিন্যাস "রূপ-ভেদের" অভাব একটি চিত্র-দোষ; যে রেখা-বিন্যাস "রূপভেদ" সাধিত করে, তাহা যদি স্থলুতার অবতারণা করে, তবে তাহাও একটি চিত্র-দোষ। তাহার নাম "স্থূলরেখত্ব"। সেইরূপ বর্ণসাঙ্কর্য্যও একটি চিত্র-দোষ। যথা,—

দৌর্ব্বল্যং স্থূলরেখত্বমবিভক্তত্বমেবচ।
বর্ণনাং সংঙ্করশ্চাত্র চিত্র-দোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পঞ্চম অংগ—সাদৃশ্য

"দৃশ্যের" সহিত তুল্যতার নাম "সাদৃশ্য।" ইহা কেবল "তুলত্যা" বলিয়া অনূদিত হইয়াছে। তজ্জন্য ইহার প্রকৃত মর্ম্ম সুব্যক্ত হইতে পারে নাই; বরং "আকারানুকরণ" ভারতচিত্রের একটি অংগ বলিয়া অভিব্যক্ত হইয়া, ভারত-চিত্রের মূল প্রকৃতি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। "দৃশ্য" কি,—তাহা বিবৃত না হইলে, "সাদৃশ্য" কি,—তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্রত্যেক বস্তুতে দুইটি বিষয় বর্ত্তমান,—"বস্তুসত্বা" এবং "বস্তু-দৃশ্য"। গো একটি চতুষ্পদ জীব। কিন্তু সকল প্রকার অবস্থানে তাহার পদচতুষ্টয় সমান ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই নাম দৃশ্য; এবং তাহার সহিত তুল্যতা সাধনের নাম "সাদৃশ্য"। পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচক রস্কিনও এই কথা বুঝাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন,—সে বস্তুতে যাহা আছে বলিয়া জান, তাহা অঙ্কিত করিও

না ; যাহা দেখিতে পাও, তাহাই অঙ্কিত কর। "দৃশ্য" দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বাহ্য এবং আন্তর। "দৃশ্য" বাহ্যজগতেই বর্ত্তমান থাকুক, অথবা অন্তর্জগতে কল্পিত হউক, যাহা "দৃশ্য" তাহারই সহিত "সাদৃশ্য" আবশ্যক। পাশ্চাত্য শিল্পে ভাবাত্মক এবং আকারাত্মক নামে যে দুইটি প্রভেদ কল্পিত হইয়া আসিতেছে, ভারত-শিল্পে তাহা অপরিজ্ঞাত। "আকার" ভারত-শিল্পের "অ-বিষয়।" "দৃশ্যই" ভারত-শিল্পের "বিষয়"। দৃশ্য দৃশ্য, তাহা আকার হইতে পৃথক্। আকারের অন্তরালে রূপ, ভাব লাবণ্য, ও দৃশ্য বর্ত্তমান আছে ;—তাহাই ভারত-চিত্রের "বিষয়" ; এবং তজ্জন্য ভারত-চিত্র আকারের অনুকরণ নহে ;—অনুভূতির অভিব্যক্তি। "সাদৃশ্য" শব্দে ইহাই সূচিত হইয়াছে, "সাদৃশ্য" তুল্যতা নহে, তাহা তুল্যতার হেতু।

ষষ্ঠ অঙ্গ—বর্ণিকা-ভঙ্গ

ইহার অনুবাদেও প্রকৃত তাৎপর্য্য সুব্যক্ত হয় নাই। ইহা তুলিকার এবং বর্ণের সুকুমার ব্যবহার-ব্যবস্থা বলিয়া অনূদিত হইয়াছে। "বর্ণিকা"-শব্দ অভিধানে নানার্থে ব্যবহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি অর্থ বর্ণকে অর্থাৎ রঙ্গকে, আর একটি অর্থ তুলিকাকে, অর্থাৎ রঙ্গ লাগাইবার যন্ত্রকে সূচিত করে। "ভঙ্গ"-শব্দের সহিত সমাস-নিবদ্ধ থাকায় "বর্ণিকা" শব্দ তুলিকাকে সূচিত করিতে পারে না ; রঙ্গকেই সূচিত করে। "ভঙ্গ" শব্দও ভাঙ্গাকে সূচিত করে না। চিত্র-সাহিত্যে "ভঙ্গ" এবং "ভক্তি" এই দুইটি শব্দ পারিভাষিক সংজ্ঞা রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাগে ভাগে বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করিবার রীতির নাম "ভঙ্গ" অথবা "ভক্তি"। যেখানে যে বর্ণের সমাবেশ আবশ্যক, সেখানে সেই বর্ণের বিন্যাসের নাম "বর্ণিকা-ভঙ্গ"। ইহার ব্যতিক্রমে বর্ণের সঙ্করতা ঘটিয়া থাকে, তাহা একটি সুপরিচিত চিত্র-দোষ। যদিও "তুলিকার" সাহায্যে "বর্ণিকা-ভঙ্গ" সাধিত হইয়া থাকে, তথাপি তুলিকা-ব্যবহারের রীতি-

বিশেষ চিত্রের অংগ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কারিকায় যে ছয়টি বিষয় উল্লিখিত, তাহা চিত্রের অংগ, সুতরাং তাহা চিত্র-বস্তু, চিত্রাঙ্কনের বস্তু নহে। ভারতীয় চিত্র-সাহিত্যে দুই শ্রেণীর রচনা দুই নামে পরিচিত হইয়াছিল,—"চিত্র-সূত্র" এবং "চিত্র-কল্প"। "চিত্র-সূত্রে" চিত্রের মূল প্রকৃতি, এবং "চিত্রকল্পে" চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মূল গ্রন্থের বিলোপ শোচনীয় হইলেও, বিবিধ নিবন্ধে, পুরাণে, তন্ত্রে এবং সাধারণ সাহিত্যে "চিত্র-সূত্র" এবং "চিত্র-কল্প" উদ্ধৃত হইয়া, অদ্যাপি সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করে নাই। তাহা যথাযোগ্যভাবে সঙ্কলিত না হইলে, ভারত-চিত্রের প্রকৃতি এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত সংস্কার পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের আলোচনায় ব্যাপ্তি লাভ করিতেছে, তাহার সংশোধনের পথ পরিষ্কৃত হইবে না।[৩]

কামসূত্র-টীকাকার যশোধর যে কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে অতি পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারিকায় ভারত-চিত্রের মূল প্রকৃতি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে ভারত-চিত্রের মূলতত্ত্বও অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

স্থান, কাল, চেষ্টা, একই মনুষ্যের "দৃশ্যকে" বিবিধ ভাবে প্রদর্শিত করে, সুতরাং চিত্র সম্পূর্ণরূপে আকারাত্মক হইতে পারে না। তাহা বাহ্য-বস্তুর আকার অবলম্বনে অভিব্যক্ত হইলেও, আকারানুকৃতি নহে, দৃশ্য-সৃষ্টি। তাহার সহিত অস্থিসংস্থান বিদ্যার সম্পর্ক বড় অধিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অস্থি অদৃশ্য; তাহার অস্তিত্ব কোন কোন স্থলে ঈষৎ প্রতিভাত হইলেও, দূরবর্ত্তী দর্শনস্থান হইতে অদৃশ্য। সুতরাং তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইতে পারে না। কিন্তু অংগ-প্রত্যংগের অস্থি-শিরা-মাংসপেশী প্রভৃতির স্বাভাবিক সংস্থানের জন্য যে সকল নতোন্নত "দৃশ্য" স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং দূরবর্ত্তী দর্শন-স্থান হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইত। শিরাগুলি প্রদর্শন করা অনুচিত বলিয়া যে

নিষেধ বাক্য প্রচলিত আছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—ভারত-চিত্র কি জন্য অস্থিসংস্থান-বিদ্যার উদাহরণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সম্মত হয় নাই!

চিত্রসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য সকলের নিকট সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে পারে না। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে পারে; কিন্তু তাহা কি জন্য মনোরঞ্জন করে, অল্প লোকেই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ংগম করিতে পারে; এবং আরও অল্প লোকেই তাহা ভাষায় অভিব্যক্ত করিতে পারে। আমাদের দেশে যত অল্প দিনের মধ্যে যতগুলি চিত্রবিদের এবং চিত্র সমালোচকের আবির্ভাব হইয়াছে, মানব-সমাজের ইতিহাসে তাহা একটি বিস্ময়জনক ব্যাপার। তাঁহারা সকলেই ভারত-চিত্রের অনুরক্ত। সুতরাং ভারত-চিত্রের মর্ম্ম-কথা পুরাতন সাহিত্যে যেখানে যে ভাবে বিবৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের কৃপায় আমরা এত দিনে তাহা সমস্তই অবগত হইতে পারিতাম। এখন পর্য্যন্ত তাহার সূত্রপাতও লক্ষিত হইতেছে না কেন, তাহাও একটি বিস্ময়জনক ব্যাপার।

কলা-সাহিত্যের মধ্যে চিত্র-সাহিত্য সর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত কলাজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে। তথাপি বাৎস্যায়ন চতুঃষষ্টি-কলার নামোল্লেখ করিবার সময়ে প্রথমে গীতের, তাহার পর বাদ্যের, তাহার পর নৃত্যের, এবং তাহার পর চিত্রের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন কেন, তাঁহার গ্রন্থে তাহার কারণ উল্লিখিত হয় নাই। পৌরাণিক সাহিত্যে তাহা উল্লিখিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যেই ভারত-চিত্রের মূলতত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। তজ্জন্য ভারত-চিত্র কদাপি উচ্ছৃংখলতার প্রশ্রয় দান করিতে পারে নাই;—যেকোনরূপ অঙ্কন-প্রয়াসকে চিত্র নামে পরিচিত করিতে পারে নাই;—ভারত-চিত্রে স্বেচ্ছাচার অপরিজ্ঞাত;—অসংকুচিত অনধিকারচর্চ্চা প্রশ্রয় লাভে অসমর্থ। ভারত-চিত্রকে সত্য-সত্যই পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব কিনা, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই। কিন্তু তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা সম্ভব। বুঝিতে হইলে, ভারত-চিত্রবিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সূত্র-পরিচিতি

১. It is possible that sometime during the pre Buddhist period the "Sadanga", or "Sin Limbs of Indian Painting", were evolved a series of canons laying down the first Principles of Art. Vatsyayaana, who lived during the third century A. D., enumerates this in his kamasutra howing entracted them from still more ancient works. These "Sin Limbs" have been translated as follows :—

1. Rupabheda—The knowledge of appearances.
2. Pramanam—Correct perception, measure and structure.
3. Bhava—Action of feelings on forms.
4. Lavanya-yojanam—Infusion of grace. Artisticrepre-sentation.
5. Sadrisyam—Similitude.
6. Varnika-bhanga—Artistic, manner of using the brush and colours. (Tagore)

২. The eye of Buddhas and the more benign Bodhists is given a dreamy look by representing the upper eyelid as dented at its centre like a Cupid's bew : but I have noticed the same peculiarity in medieval Indian Buddhist sculptures.—W. ddelle's Buddhism of Tibet, p. 330.

৩. সম্প্রতি ইউরোপীয় বিদুষী কুমারী ক্রামরিস্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-চিত্র সম্বন্ধে যে ভাবে বক্তৃতা করিতেছেন, তাহা অনেক স্থলে ভারত-চিত্র সাহিত্যের বিপরীত সিদ্ধান্তই প্রচারিত করিতেছে।

রাজসাহী নগরের সাত মাইল পশ্চিমোত্তরে দেওপাড়া নামে একটি পুরাতন স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা একখণ্ড উচ্চ-ভূমির উপর অবস্থিত। তিন দিকে গভীর পরিখার আকারে একটি খাড়ি, এবং একদিকে সমতল নিম্নভূমি, এই স্থানকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। খাড়ির উপর ডিস্ট্রিক্‌ট্‌ বোর্ড যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে, তাহার সাহায্যে এই উচ্চভূমির উপর দিয়া উত্তরাঞ্চলে যাতায়াত করিবার একটি পথ চলিয়া গিয়াছে। এখন একাংশে অল্পসংখ্যক কুটীরে একটি কৃষক-পল্লী স্থাপিত হইয়াছে; অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সকল স্থানই বিজন অরণ্যে সমাচ্ছন্ন ছিল। তাহার মধ্যে কতকগুলি সুবৃহৎ পুরাতন পুষ্করিণী পূর্ব্ব সমৃদ্ধির মূক সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, এই স্থানকে শিকারপ্রিয় সাহেব সুবার সুপরিচিত শিকার ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। একটি পুষ্করিণী "পদ্ম-সহর" নামে কথিত হইত কিন্তু সে নাম-রহস্য কেহই উদঘাটিত করিতে পারিত না।

অর্দ্ধ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ অধিককাল পূর্ব্বে মেটকাফ নামক রাজসাহীর এক কালেক্‌টার শিকার উপলক্ষে এখানে উপনীত হইয়া জানিতে পারেন, —পদ্ম-সহর-পুষ্করিণীর জলতলে অনেক প্রস্তরখণ্ড লুক্কায়িত আছে। পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত একখণ্ড প্রস্তরে অনেক পংক্তি ক্ষোদিত—লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিপিযুক্ত শিলা ফলকখানি রাজসাহীতে আনয়ন করিয়া, রাজসাহীর ধর্ম্ম-সভাচার্য্য স্বর্গীয় রামধন তর্করত্ন মহাশয়ের দ্বারা পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করাইয়া, একটি ইংরাজী অনুবাদ সহ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। সেখানে উহা এখন যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে; এখন স্বনামখ্যাত ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা-সুসংস্কৃত হইয়া, পরলোকগত অধ্যাপক কিলহর্ণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপে জানিতে পারা গিয়াছে,—সেন রাজ-বংশের প্রথম

রাজা বিজয় সেন দেব দেওপাড়ায় একটি সুগভীর পুষ্করিণী খনিত করাইয়া, তাহার তীরে এক অত্যুচ্চ দেব-মন্দির নির্মিত করাইয়াছিলেন, এবং তাহাতে প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক হরিহর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করাইয়া, রাজ-পদোচিত সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মূর্ত্তি নাই; তাহার মন্দিরও লোক-লোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু পুষ্করিণীটি তাহারই স্মৃতি রক্ষা করিরা এখনও "পদ্দুম-সহর" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে।

এই শিলালিপিখানি বাঙ্গলার ইতিহাসের এক সংশয়শূন্য ঐতিহাসিক বিবরণের সন্ধান প্রদান করিয়া, সেন রাজবংশের অভ্যুদয় কাহিনীর পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ইহাতে বিজেতা বিজয় সেন দেবের "বংশ-বীর্য্য শ্রুতামি" বিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে; তিনি যে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহার ঐশ্বর্য্য-গর্বের পরিচয়ও অন্তর্নিবিষ্ট আছে, এবং প্রসঙ্গ ক্রমে প্রশস্তি-রচয়িতা কবির এবং সুনিপুণ ভাস্করের নাম গুণ-গ্রাম উল্লিখিত আছে; সমসাময়িক লোক-ব্যবহারেরও নানা বিস্ময়স্পূর্ণ বিস্মৃত বিবরণ স্থানলাভ করিয়াছে। ইহা ধরিয়া যে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত হইয়াছিল, অদ্ধ শতাব্দীর বিবিধ বিচার বিতণ্ডায়, অদ্যাপি তাহা পরিসমাপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালী যখনই প্রকৃত আন্তরিকতার সহিত তাহার পুরাকীর্ত্তির যথাযোগ্য আলোচনার আয়োজন করিবে, এবং তাহার প্রয়োজন অনুভব করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তখনই এই প্রশস্তির এবং দেওপাড়ার ভস্মাবশেষের সন্ধান লইতে হইবে; প্রত্যেক বাঙ্গালীর কথা দূরে থাকুক, বহু সুনিশ্চিত বাঙ্গালীর নিকটেও দেওপাড়া অদ্যাপি অজ্ঞাত, অখ্যাত; অথবা অপরিচিতের ন্যায় অযথা অবজ্ঞাত।

আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী বাঙ্গালীকে ঘর অপেক্ষা পরের দিকে অধিক আকর্ষণ করিতেছে। যখন এই শিক্ষা-প্রণালীর সূত্রপাত হয়, তখনকার অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল; তখন ইহা স্বদেশ-প্রীতিকে স্ফূর্ত্তি দান না করিয়া, স্বদেশ-বিরক্তিই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং দেওপাড়ার

ধ্বংসাবশেষ যে দীর্ঘকাল বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। বহু কালের পর, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, কতিপয় বাঙ্গালী যুবক দেওপাড়ায় সমবেত হইয়া তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত করিয়া, বরেন্দ্র, অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠা সাধন করেন। তাহারা প্রদ্যুম্নেশ্বর—সরোবরে কোনও প্রস্তরখণ্ড লুক্কায়িত থাকিবার সন্ধান না পাইলেও, তাহার পূর্ব তীরে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরদ্বারের বৃহদায়তন পাষাণ নির্ম্মিত একটি উড়ুম্বরের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে মৃত্তিকা খনন করিয়া বাহির করিয়াছিলেন; কিন্তু তত বড় পাষাণখণ্ড স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হন নাই। দশ বৎসরের চেষ্টায় উক্ত সমিতির ও রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অর্থসাহায্যে, দ্বিসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে, সমিতির সদস্যগণ প্রদ্যুম্নেশ্বর—সরোবরের-পূর্ব্বাংশের পঙ্কোদ্ধার-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, ইষ্টক-রচিত ঘাট এবং তাহরে উপর হইতে মৃত্তিকা-নিহিত বহুসংখ্যক ভাস্কর্য্য নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, গবর্ণমেণ্ট এখন ঐ স্থান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে যে সকল ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়া সে-কালের বঙ্গ-ভাস্কর্য্যের পরিচয় উদঘাটিত করিয়াছে, তন্মধ্যে একটির প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল। ইহা মকরবাহিনী গঙ্গাদেবীর লীলা-মূর্ত্তি,—বাঙ্গালীর শিল্প-লালিত্যের রমনীয় নিদর্শন। ইহা যে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের দ্বার-শোভা সম্পাদন করিত, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

প্রশস্তি পাঠে জানিতে পারা যায়, সৌভাগ্যের দিনে এই পুষ্করিণী পুর-রমণীগণের অবগাহনাবিধৌত স্তন-চন্দন সৌরভে-ভ্রমরগণকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিত। যে ইষ্টকরচিত ঘাট বাহির হইয়াছে, তাহা এত বৃহৎ যে, একসঙ্গে বহু সংখ্যক লোকের অবগাহনের সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যেই তাহা ঐরূপ বৃহদায়তনে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উৎসব-দিবসে মন্দির-সমীপে আরও কত নরনারী নানা দিগ্‌দেশ হইতে আসিয়া সমবেত হইত। জয়দেবের সম-সাময়িক উমাপতি ধর এই প্রস্তর-প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন,

তজ্জন্য ইহা নানা ঐতিহাসিক ব্যাপারের সুদীর্ঘ নির্ঘণ্ট হইলেও, কাব্য-রসে অভিষিক্ত, রচনা লালিত্যে উপভোগযোগ্য। যে যুগে ইহা রচিত হইয়াছিল, তাহা গৌড়িয় রচনা-রীতির গৌরব-যুগ। তখনকার প্রধান প্রধান কবিগণের নাম গীত গোবিন্দে উল্লিখিত আছে। যথা,—

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরিং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রময়েবচনৈ রাচার্য্য গোবর্দ্ধনঃ
স্পর্দ্ধর্ষ কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবি-ক্ষ্মাপতি॥

ইহাদের কোন-কোন কবিতা "সুদুক্তি কর্ণামৃত" নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল; এবং কোন-কোন কবিতা মুখে-মুখে বাঙ্গালার চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের মধ্যে অদ্যাপি আলোচিত হইয়া আসিতেছে। দেও-পাড়াপ্রশস্তির দুই একটি কবিতা এইরূপে সুবিদিত ছিল, কিন্তু প্রশস্তির কথা অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। জয়দেব লিখিয়া গিয়াছেন,—"উমাপতি ধর বাক্যকে পল্লবিত করিতেন।" এই প্রশস্তিতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাপি ইহা রচনাশক্তির বিলক্ষণ বিচক্ষণতার উদাহরণ। পুষ্করিণীটির পরিচয় এইরূপ ঃ—

বিলেশয় বিলাসিনী-মুকুট কোটিরত্নাঙ্কুর
স্ফুরৎ কিরণ মঞ্জরীচ্ছুরিত বারিপূরং পুরঃ।
চখান পুরবৈরিণঃ স জলমগ্নপৌরাঙ্গনা
স্তনৈণ মদ সৌরভোচ্চালিত চঞ্চরীকাং সরঃ।

প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের যে উড়ুম্বর ফলক বাহির হইয়াছে, তাহার অনুপাত অনুসারে হিসাব করিলে জানিতে পারা যায়, পুরীধামের জগন্নাথ দেবের মন্দির অপেক্ষাও এই মন্দির বৃহত্তর ছিল। প্রশস্তি পাঠে জানা যায়, তাহার শীর্ষদেশে একটি স্বর্ণ-কুম্ভ সংস্থাপিত ছিল। মন্দির যে অসাধারণ আয়তনের, তাহার পরিচয় প্রকাশের জন্য, বাক্যকে পল্লবিত করিয়া, উমাপতি লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

স্রষ্টা যদি স্রক্ষ্যতি ভূমিচক্রে
সুমেরু মৃৎপিণ্ড বিবর্ত্তনাভিঃ।
তদা ঘটঃ স্যাদুপমানমস্মিন্
সুবর্ণকুম্ভস্য তদর্পিতস্য॥

এই মন্দির-মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বরদেবের বর্ণনা করিতে গিয়া উমাপতি এক অপূর্ব রচনা কৌশলের পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য সেনরাজকুলের গৌরব-কীর্ত্তন, কিন্তু তাহার বাহ্য আবরণ ভগবদগুণ-কীর্ত্তন। হরিহর-মূর্ত্তিধর মহাদেব প্রকৃত পক্ষে দিগম্বর, তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তিধর বলিয়া তাঁহার নাম, অর্দ্ধাঙ্গনাস্বামী, শ্মশানই তাঁহার বসতিস্থান, ভিক্ষাই জীবন ধারণের অবলম্বন, সুতরাং তাঁহার মত দরিদ্র আর কোথায় আছে; সেন রাজবংশ দরিদ্র-পালনে অভিজ্ঞ বলিয়াই বিজয় সেন দেব সেই শ্মশানবাসী ভিক্ষান্ন-ভোজী দিগম্বর প্রদ্যুম্নেশ্বরকে উচ্চিত্রবসনে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, অর্দ্ধাঙ্গনাস্বামীর সেবার জন্য রত্নালঙ্কার বিভূষিতা একশত দেবদাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, শ্মশানবাসীর বসতির জন্য পৌরজনাঢ্য পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ভিক্ষান্ন-ভোজীর জন্য অক্ষয় লক্ষ্মীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। যথা,—

উচ্চিত্রানি দিগম্বরস্য বসনান্যর্দ্ধাঙ্গনাস্বামিনো
রত্নালঙ্কৃতিভি বিবশোষিত বপুঃ শোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাঢ্যাশ্চ পুরীঃ শ্মশানবসতে ভিক্ষাভুজোঽস্যাক্ষয়াং
লক্ষ্মীং স ব্যতনোদ্দারিদ্রভরনে সুজ্ঞোহি সেনাম্বয়ঃ॥

এই স্থান—দেওপাড়া—যে মহানগরীর পল্লী-বিশেষ ছিল, তাহা এখনও "বিজয়নগর" নামে পরিচিত, পদ্মাতীরে এক সমুচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত বহুশত পুরাতন পুষ্করিণীর ও অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি-সূচক নানা ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে; খনন কার্য্যের সুব্যবস্থা হইলে, আরও অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবার আশা আছে।

বিজয় সেন দেবের প্রস্তর-প্রশস্তিতে যে শিল্পীর পরিচয় উল্লিখিত আছে, তাহার নাম শূলপাণি; তিনি "রাণক" বলিয়া কথিত; এবং "বরেন্দ্র-শিল্প গোষ্ঠীচূড়ামণি"—উপাধিভূষিত ছিলেন। একদা বাঙালী যে প্রস্তর-শিল্পেও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, একালের অনেক বাঙালী তাহা মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ করেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা—বাঙালী যে ভাস্কর্য্য বিদ্যায় অনুশীলনে কৃতিত্বলাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রধান প্রমাণ—বাঙলা দেশের নানা স্থানে প্রাপ্ত পুরাতন ভাস্কর্য্য-নিদর্শন। তাহার বিশিষ্টতা তাহাকে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ভাস্কর্য্য-নিদর্শন হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালীর আচার-ব্যবহারে, ধ্যান-ধারনায়, আশা-আকাঙ্খায়, অভিজ্ঞতায় উচ্চাকাঙ্ক্ষায় যে বিলাসলীলা পল্লবিত হইয়া, বাঙ্গালীকে সমগ্র ভারতবর্ষে এক অতুলনীয় বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল, বাঙালার শিল্পেও তাহার অভিব্যক্তি দেদীপ্যমান। নানা যুগের নানা দেশের শিল্প-নিদর্শনের তুলনায় সমালোচনা করিতে যাঁহাদের চক্ষু অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেরূপ পরিদর্শক মাত্রেই রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহালয়ে আসিয়া, সংগৃহীত শিল্প-নিদর্শনগুলিকে বাঙালীর নিজস্ব বলিয়াই অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ কি,—সম্প্রতি বিদুষী স্তেলা ক্রামরীস তাহার ব্যাখ্যাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

এ সকল বিষয়ের একটি সুপরিচিত প্রধান প্রমাণ দেশের লোকের স্মৃতি, অর্থাৎ বংশ-পরম্পরা-প্রচলিত জনশ্রুতি বাঙালী দুর্ভাগ্যক্রমে স্মৃতিহীন, জনশ্রুতিহীন,—অতীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আস্থাহীন হইয়াছে বলিয়া, বাঙ্গালীর পক্ষে এই শ্রেণীর প্রমাণও দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। মদনপাল দেবের রাজ্যকালে কলিবাল্মীকি—উপাধিধারী বারেন্দ্র কবি সন্ধ্যাকর নন্দী, (রামচরিত কাব্যে) শিল্পকৌশলে তাঁহার জন্মভূমি কিরূপ গৌরব লাভ করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কলা-

লালিত্য বাঙ্গালীকে যে বিশেষভাবে বিশিষ্ট চর্চায় নিবিষ্ট করিয়াছিল, তাহার নানা কারণ বর্ত্তমান ছিল। বাঙ্গালীর ন্যায় আর কেহ এত অসংখ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত না;—আর কাহাকেও প্রতিমা সাজাইবার জন্য বাংগালীর ন্যায় অগণ্য শিল্প কৌশলের উদ্ভাবনা করিতে হইত না। কিন্তু প্রস্তর শূন্য বাঙ্গালার সমতল ক্ষেত্রে প্রস্তর-শিল্পের অভ্যুদয় বাঙ্গালীর পক্ষে বিস্ময়জনক বলিয়াই প্রতিভাত হইবার কথা। কতকগুলি কারণে এই অসম্ভব ব্যাপারও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়াছিল।

বাঙ্গাল-চরিত্র কঠোর-কোমলের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্য শ্যামলা বংগভূমি স্বভাব-কোমলা হইলেও, আততায়ীর অত্যাচার হইতে নিয়ত আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া, তাহাকে কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইত। বংগভূমি যখন ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তখন বাংগালীর একটি স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রবল প্রভাব কাশী কান্যকুব্জে, মগধে উৎকলে, কামরূপে হিমালয়-ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ন্যূনাধিক চারিশত বৎসর বাঙ্গালীর এই বিজয়-রাজ্য বাংগালীর স্বভাবগত স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার ক্রমবিকাশ সাধিত করিয়া, শিক্ষা-দীক্ষায়, ধ্যান-ধারণায়, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, সাহিত্য-শিল্পে, আচারে-ব্যবহারে এক নূতন শক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ স্বতন্ত্র-শাসনযুগে বাংগালীর রচনা-প্রতিভা কঠোর-কোমলের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিহাসে ইহাই পাল সাম্রাজ্যযুগ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছে। ইহার কথা এখন আর স্বপ্ন কাহিনী নহে; তথাপি এখনও ইহার সকল অবস্থার যথাযোগ্য বিশ্লেষণ সাধিত হয় নাই বলিয়া, অনেক কথা লোক সমাজে সুপরিচিত হইতে পারে নাই। তাহার মধ্যে প্রধান কথা শিল্পের কথা।

লামা তারানাথের তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে

প্রসঙ্গক্রমে এতদ্বিষয়ক যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লিখিত আছে, তাহা ক্রমে অধিক পরিমাণে সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তাহাতে লিখিত আছে,—ভারতবর্ষে স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে পর্য্যায়ক্রমে দেব-যক্ষ-নাগ নামক তিনটি শিল্প পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল ; তাহার পর কিয়ৎকাল শিল্প-চর্চ্চা বড় অধোগতি লাভ করে। পুনরায় দুই স্থানে দুইবার শিল্পের পুনরুজ্জীবন সাধিত হইয়াছিল। মগধে বিম্বিসার নামক শিল্পীর প্রতিভায় দেব-শিল্প রীতির এবং বরেন্দ্রে (ধর্ম্মপাল ও দেবপাল নামক নরপতিদ্বয়ের শাসন সময়ে) ধীমানের প্রতিভায় মণ্ড শিল্পরীতির পুনরুজ্জীবন সাধিত হইয়াছিল। ধীমান ও তাহার পুত্র বীতপাল বরেন্দ্রে ও মগধে এই রীতি প্রচলিত করিবার পর ইহার প্রভাব নেপালাদি দেশের ভিতর দিয়া দূরদূরান্তরেও ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল। এই শিল্পরীতির প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ক্রমশঃ তাহার নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে। নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষের খনন কার্য্য আরব্ধ হইবার পর, তাহার মধ্যে ধর্ম্মপাল-দেবপাল শাসন-সময়ের লিপি-সংযুক্ত যে সকল নিদর্শন বাহির হইয়াছে, তাহা এখনও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কুক্ষিগত ;—ঐ বিভাগ হইতে প্রকাশিত না হইলে, বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা প্রকাশিত (করিবার বা অনুমতি ব্যতীত পরীক্ষা) করিবারও অধিকার নাই। লেখক এবং বিদুষী স্তেলা ক্রামরীস সেগুলি এক সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার যে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, বরেন্দ্রে আবিষ্কৃত ভাস্কর্য্য কীর্ত্তির সহিত নালন্দায় আবিষ্কৃত এই সকল ভাস্কর্য্য কীর্ত্তির কুলপ্রথানুগত সাদৃশ্য দেদীপ্যমান।

ইহাকে একটি আকস্মিক সৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। ইহা একটি ধারাবাহিক শিল্প চর্চ্চার ক্রমাভিব্যক্ত পরিণাম বলিয়াই বর্ণিত হইতে পারে। সেই অভিব্যক্তি অনেক দিন হইতে একটি স্বতন্ত্র ধারা অবলম্বন করিয়াছিল ; —তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাচ্য, পরপ্রভাবশূণ্য, বিশুদ্ধ

ভাস্কর্য্যধারা,—গুপ্তযুগের সরল সৌম্য প্রশান্ত গাম্ভীর্য স্থিতিভঙ্গীর ভিতর দিয়া যে শিল্প সৌন্দর্য্য উদঘাটনের চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা গতি-ভঙ্গীর ভিতর দিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া এক স্বতন্ত্র—অনন্যসাধারণ —রচনা-রীতি প্রচলিত করিয়া, বাঙ্গালীর বিজয় ঘোষণা করিয়াছিল। ইহার কথা এখন ক্রমশঃ আলোচিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বিদুষী স্তেলা ক্রামরীস বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মন্তব্য পুস্তকে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং বিজয়সেন দেবের প্রদ্যুম্নেশ্বর সরোবরের পঙ্কোদ্ধারকালে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক গঙ্গমূর্ত্তি প্রভৃতি যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিলে, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে,—বঙ্গ শিল্পের অধোগতির প্রকৃত কাল মুসলমান শাসনকাল; তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারাই অব্যাহত ছিল। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে ভারত-শিল্পের ইতিহাস-রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা ফার্গুসনের প্রথম সিদ্ধান্তকেই শেষ কথা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। সে কথা, তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া, এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়াছিল যে,—"ভারত-শিল্পের ইতিহাস ক্রমাবনতির ইতিহাস।"

সুতরাং তাহার মতান্ধতার অনুকরণ করিয়া, পরবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে অনেকেই লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"গুপ্তযুগই শেষ শিল্পযুগ,—তাহার পর ভারত-শিল্প ক্রমে অবনতির দিকেই অগ্রসর হইয়াছে।" তারানাথের গ্রন্থে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না; বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সংগৃহীত শিল্প-নিদর্শনে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না; নালন্দার খননকার্য্যে যে সকল লিপি-সংযুক্ত শিল্প-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না; খৃষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে প্রাচ্য ভারতে

যে নবজীবন মুক্তিলাভ করিয়া নানা বিষয়ের অভ্যুদয় সাধন করিয়াছিল, এবং স্থলপথে জলপথে বহুদূরদেশে আত্মপ্রভাব ব্যাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাতেও ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং নূতন উদ্যমে ভারত-শিল্পের ইতিহাস সঙ্কলনের আয়োজন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

তাহার প্রধান কথা বরেন্দ্রের কথা,—ধীমানবীতপালের কথা,—বাঙ্গালীর শিল্প প্রতিভা-বিকাশের কথা,—এবং সেই শিল্পের বিশিষ্ট লক্ষণের কথা। তজ্জন্য সেই গৌরবোজ্জ্বল বিজয় যুগের শিল্প-নিদর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া, অক্লান্ত চেষ্টায় দীর্ঘকাল হইতে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাঁহারা অশোভন ব্যস্ততার ও অধীর বিজ্ঞাপন লোলুপতার বশবর্ত্তী হইয়া, ছাপাখানার দিকে দৌড়াইয়া যাইতে অসম্মত বলিয়া, তাঁহাদের অনুসন্ধান ফল প্রকাশিত হয় নাই। এখন তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে ; এবং বিদুষী স্তেলা-ক্রামরীস তাহার অগ্রদূতী হইয়া, কোন কোন কথা আকারে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়া দিয়া, আলোচনার পথ উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন।

শিল্প-প্রতিভার সঙ্গে উপাদানের সম্বন্ধ আছে। অনেক সময়ে প্রতিভা উপযুক্ত উপাদান নির্ব্বাচন করিয়া লয়, কখনও বা উপাদানই প্রতিভার বিকাশ-সাধনের সহায় হইয়া থাকে। বাঙ্গালার ভাস্কর্য্য-চর্চ্চার সঙ্গে উপাদানের এইরূপ একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধ সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি পথে পতিত হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ভাস্কর্য্য-নিদর্শন দর্শন করিলে জানিতে পারা যায়,—বালুকা-প্রস্তরই প্রধান উপাদানরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার ভাস্কর্য্যের উপাদান পৃথক ;—তাহা একপ্রকার প্রস্তরীভূত কর্দ্দম, কাষ্ঠ প্রস্তর নামে পরিচিত—স্নিগ্ধ এবং কৃষ্ণবর্ণ। ইহা প্রস্তরীভূত বলিয়া কঠিন ; কর্দ্দম মূলক বলিয়া কোমল ; প্রস্তরীভূত কর্দ্দম বলিয়া কঠিন-কোমলের মিশ্রণোৎপন্ন অন্যান্য সাধারণ

উপাদান। এই উপাদানে যে ভাস্কর্য্য লীলা আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল, তাহা বিশিষ্টতা-বিমণ্ডিত ; তাহার জন্যই অন্যান্য প্রদেশের ভাস্কর্য্য—নিদর্শন হইতে সহজেই ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি অবনতির লক্ষণ নহে, উন্নতির লক্ষণ,—কোন-কোন বিষয়ে সমগ্র ভারত-শিল্পের মধ্যে অতুলনীয় উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে। ভারত-ভাস্কর্য্যের ইতিহাস নামধেয় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ইহার কথা এখনও যথাযোগ্যরূপে আলোচিত হয় নাই ; বাঙ্গালীও অদ্যাপি তাহার জন্মভূমির এই পূর্ব্ব গৌরব-নিদর্শনের যথাযোগ্য আলোচনার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহা যেরূপ বহুব্যয়সাধ্য, সেইরূপ অসীম-অধ্যবসায়সাধ্য কঠিন তপস্যা। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী বাঙ্গালীকে তাহার উপযোগী করিয়া না তুলিয়া, দিন-দিন অধিক অনুপযোগী করিয়া তুলিতেছে।

এ পর্য্যন্ত যে সকল বঙ্গভাস্কর্য্য—নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলির ছবি প্রকাশিত হয় নাই, সকলগুলি এক স্থানেও সংগৃহীত হয় নাই। সুতরাং অধ্যয়নার্থীর পক্ষে নানা অসুবিধা এখনও বিষয়টিকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে। ছবি দেখিয়া বিচার করিতে হইলে যেরূপ অভিজ্ঞতা আবশ্যক, অল্প দিনে বা অল্প আয়াসে তাহা অধিগত হইবার নহে। সুতরাং অনুসন্ধান কার্য্য এখনও ধারাবাহিক বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিতে না পারিয়া, আকস্মিক আবিষ্ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। বঙ্গভাস্কর্য্যের বিশিষ্ট লক্ষণ কি, এই সকল কারণে; তাহা আলোচিত হইতে পারিতেছে না। শিল্পচর্চ্চার বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া যে সকল সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অনুসন্ধান স্পৃহা এবং অধ্যয়ননিষ্ঠা অপেক্ষা রচনা-লোলুপতা অধিক উৎসাহ লাভ করিতেছে। তাঁহারা পুরাতনের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিয়া সৃষ্টি কার্য্যে কুশলতা প্রকাশ করিতে পারিলে, পুরাতন শিল্প কৌলিন্যধারা অব্যাহত থাকিতে পারিত।

যাঁহারা ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য পুরাতন ভাস্কর্য্য নিদর্শনের আবিষ্কার ও সংগ্রহ-কার্য্যে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহারা মূর্ত্তি-পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তাহার বর্ণনা-বিজ্ঞাপক রচনাবলী উদ্ধৃত করিবার জন্যই অবসর-শূন্য। কি শিল্প চর্চ্চা সমিতি, কি ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান—সমিতি কেহই পুরাতন বঙ্গ-ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের প্রতি সাধারণ পাঠক বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বঙ্গ ভাস্কর্য্য—নিদর্শন যাহার বাহ্যবিকাশ মাত্র, সেই পুরাতন বাঙ্গালী-জীবনের আশা-আকাঙ্খার পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়াস প্রকাশে সকলেই সমান উদাসীন। ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের মধ্যে বাঙ্গালীর আত্মপরিচয় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে বাঙ্গালী যেমন নানা বিষয়ে বিশিষ্টতার পরিচয় প্রদান করে, বাঙ্গালীর ভাস্কর্য্যের অবস্থাও সেইরূপ। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী তাহার আত্মকথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে ; ইহার মধ্যেই তাহার আশা-আকাঙ্খা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছে।

কি ইতিহাস চর্চ্চা, কি শিল্প চর্চ্চা কিছুই অদ্যাপি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই ; অল্পদিন মাত্র উভয়েরই যৎকিঞ্চিৎ সূত্রপাতের সূচনা হইয়াছে। কিন্তু অধপতিত বাঙ্গলার দুর্ভাগ্যক্রমে এই অল্পদিনের মধ্যেই ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পের একটি অমূলক বিরোধাভাষ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের মধ্যে বিরোধ নাই, এবং থাকিতে পারে না। কারণ উভয়ের আলোচনাক্ষেত্র অভিন্ন,—তাহা স্বদেশ এবং স্বজাতি।

শুদ্ধিপত্র ও সংযোজনা

পৃষ্ঠা / পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ / সংযোজনী	শুদ্ধ
৩।২০	uniuspired	uninspired
৮।৩	আবন্ধ	আরব্ধ
৯।৪	সংযোজন—তিনি বরেন্দ্রের শিল্প-গোষ্ঠী-চূড়ামণি রাণক শূলপাণি।	
৯।৫	পরিচিত	পরিচিতি
৯।৮	Indiustriel	Industrial
১২।১৪	চিরজীবি	চিরজীবী
১৩।২০-২১	আলোকসামান্য	অলোকসামান্য
১৪।৫	শক্তি-সামর্থ	শক্তি-সামর্থ্য
১৫।৩২	তচ্ছাত্রমিতি	তচ্ছাস্ত্রমিতি
১৫।১৮	বিদেশীর	বিদেশীয়
১৬।৩	কৌলিন্যের	কৌলীন্যের
১৬।১৩	আধিগত	অধিগত
১৯।১৪	বিপশ্চিত…অবিপশ্চিত	বিপশ্চিৎ…অবিপশ্চিৎ
২০।১২	অ-বিপশ্চিৎগণের	অ-বিপশ্চিদ্‌গণের
২০।২৪	কৌলিন্য	কৌলীন্য
২১।২-৩, ৪	খেলালীগণ	খেলালিগণ
২২।৩	আর্য	আর্ষ
২২।৫	কল্লকভট্	কল্লটভট্ট
২২।১৪	শিল্পীগণ	শিল্পিগণ
২২।২৩	শিল্পসংষ্কার	শিল্পসংস্কার
২৩।৩	কৌলিন্যহীন	কৌলীন্য-হীন
২৪।৪	mouleded	moulded
২৪।৭	imtensity	intensity
২৪।১৩	কৃচ্ছ্বতা	কৃচ্ছ্রতা
২৬।শীর্ষ	ভারতশিল্পতত্ত্ব	ভারতশিল্পতত্ত্ব (১)
২৬।৮	কিয়াছে	করিয়াছে
২৬।১৬	পয়িচয়	পরিচয়
২৬।১৮	শীল…উর্ণাদি	শীল্…উণাদি
২৭।২৪	শিল্পহস্তে	শিল্পিহস্তে

পৃষ্ঠা / পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮।১০	উদ্ধৃতি	উদ্ধৃত
২৮।১৪	পঞ্চমশ্চকারশ্চ	পঞ্চমশ্চর্মকারশ্চ
২৮।১৫	সকল	এই সকল
২৮।১৬	পরিচিত ছিল, এই কারণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, —সকল "সকল" সেকালে "শিল্পী" নামেও কথিত হইত।	পরিচিত ছিল, অর্থাৎ এই সকল জাতি সেকালে "শিল্পী" নামেও কথিত হইত।
২৮।২৫	শিল্পিকে	শিল্পীকে
২৯।৮	ভক্ত	ব্যক্ত
২৯।১৪	মূর্খ্য	মূর্খ
২৯।১৫	যৎ স্যাৎ…সংজ্ঞিতং	যৎ স্যাদ্…সংজ্ঞিতম্
২৯।১৬	শক্তৌ	শক্তো
২৯।১৭	একীট	একটি
৩১।১৩	শূণ্য	শূন্য
৩২।৬	অন্য	জন্য
৩২।১৪	হন	হয়
৩৩।২৪	সমূখিত	সমূচিত
৩৩।২৬	সংকল্প	সম্পূর্ণ
৩৪।৩	অধ্যয়ন-নিপুণতা	অধ্যয়ন-নিপুণতা অপেক্ষা
৩৪।৪	অধ্যয়ন-নিনপুনতার অভাব,—	অধ্যয়ন-নিপুণতার অভাবে
৩৪।১৪	বর্ণাঢ্য মিতরে	বর্ণাঢ্যমিতরে
৩৬।১৫	ব্রাহ্ম	ব্রহ্মা
৩৬।১৬	বৃহস্পতি	বৃহস্পতী
৩৬।১৭	অষ্টাদশিতে	অষ্টাদশৈতে
৩৬।১৯	অষ্ট	ষষ্ঠ
৩৬।২৩	রামরজ	রামরাজ
৩৬।২৫	বিলুপ্ত প্রাপ্ত	বিলুপ্তপ্রায়
৩৭।৭	প্রাচ্যকাব্যে	শ্রব্যকাব্যে
৩৭।১৪	ইহার প্রতি	ইহা
৩৭।১৯	শিল্পতে	শিল্পকে

পৃষ্ঠা / পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭।২২	বিদেশীর	বিদেশীয়
৩৮।১	তাঁহার	তাঁহারা
৩৮।১২	স্বতই	স্বতঃই
৩৮।১৩	দূরেতর	দৃঢ়তর
৩৮।১৪	ঈষদ্ভিন্ন	ঈষদ্‌দ্ভিন্ন
৩৯।১	সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
৩৯।৬	সমাজের	সমাজে
৩৯।১১	চতুঃষষ্টিকলা, অনুশীলনের	চতুঃষষ্টিকলা অনুশীলনের
৩৯।২১-২২	"ঔপেয়িকী"—উপায়—সভ্য	"ঔপায়িকী"—উপায়-লভ্য
৩৯।২৩	ঘৃতাশ্রয়া	দাতাশ্রয়া
৩৯।২৪	"উপচারিকা"	"শয়নোপচারিকা"
৩৯।২৫	অন্তর্ণিবিষ্ট "অন্তর কলার"	অন্তর্নিবিষ্ট "আন্তর কলার"
৪০।১৪৩	"অন্তরকলার"	"আন্তরকলার"
৪০।১৪	গিরিবান্ধব	গিরিকন্দর
৪০।১৫	কঙ্কাল বিশিষ্ট	কঙ্কালবশিষ্ট
৪০।২০	সিদ্ধান্ত যে	সিদ্ধান্তে
৪১।৫	মহার্নব	মহার্ণব
৪১।৭	সাহিত্যের	সাহিত্যে
৪১।৮	ভস্মীভূত	পুঞ্জীভূত
৪১।১০	(৭) (১.২)	(৭. ১.২)
৪১।২১	সেকালের	সেকাল
৪১।২৫	ফর্ডসন্	ফার্গুসন্
৪২।১৭	ভাবশ্বর্য্যের…সমহিত	ভাবৈশ্বর্য্যের…সমাহিত
৪৬।২১	প্রভাব মাত্র।"	প্রভাব মাত্র।" [৪]
৪৭।১৬	চন্দ্রমা	চন্দ্রমাঃ
৪৯।২৫	করিয়াছে।	করিয়াছে,
৫০।২	আমাদিগের	যাহাদিগের
৫১।২৪	cannons	canons
৫১।২৮	Gaeek	Greek

পৃষ্ঠা / পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৪।৪	মাটী	মাটি
৫৫।২০	অজ্ঞানান্ধকার	অজ্ঞানান্ধকারে
৫৫।২৩	তূলিকা	তুলিকা
৫৭।১৭	স্তরেই	স্তরেও
৫৭।২০	সাধরণ	সাধারণ
৫৯।৫	অসম্মত	অসম্মত
৬০।৫	আনিত্যং দুখ্যং	অনিত্যং দুঃখম্
৬০।৮	জম্মদিন	জম্মদান
৬০।১১	শ্রীমূর্তি নিয়ে	শ্রীমূর্ত্তিশিল্প
৬১।১০	ganges	Ganges
৬১।১৩	crete	Crete
৬১।২৬	vedic	Vedic
৬২।১৮	শিল্পীগৃহে	শিল্পগৃহে
৬৩।২২	গলিচা	গালিচা
৬৩।৪৩	প্রস্তুত	প্রস্তুত করার
৬৪।১৫	ঝুলিতেছে	খুলিতেছে
৬৪।১৯	সুটির	সুতীর
৬৪।২০	ক্রমে তাহা	তাহা
৬৫।৯	শিল্পালোচনা	শিল্পজীবন
৬৬।৫	বিকল	বিফল
৬৬।১৮	অদ্যপি	অদ্যাপি
৬৬।২৫	বরং…সৌন্দয্য	রং…সৌন্দর্য্য
৭০।১৬	কৌলিন্যহীন	কৌলীন্যহীন
৭১।১৯	চিত্র—সাহিত্য-দর্পণের	চিত্র-"সাহিত্যদর্পণের"
৭১।২৬	অযত্ন—সম্ভূত	অযত্নসম্ভূত
৭২।৮	°মলীমসং	°মলীমসম্
৭৩।২	°রাদিকং	°রাদিকম্
৭৩।৪	বর্জ্জিতং	বর্জ্জিতম্
৭৩।১৬	তপাপি	তথাপি
৭৩।২১	যোজনং	যোজনম্
৭৫।১৩	°ভূসিতান্যেব	°ভূষিতান্যেব
৭৫।১৪	ভূষিতবং	ভূষিতবদ্

পৃষ্ঠা / পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৭।১৪	মৎস্যোদর	মৎস্যোদরবৎ
৭৭।১৫	পদ্মপত্রানিভ	পদ্মপত্রনিভ
৭৮।৪	শষ্যতে	শস্যতে
৭৮।৬	বেদনাশ্তস্য	বেদনার্ত্তস্য
৭৮।৯	নেত্ত	নেত্র
৭৯।৯	স্থলুতার	স্থূলতার
৭৯।১৩	বর্ণনাং	বর্ণানাং
৭৯।১৫	তুলত্যা	তুল্যতা
৭৯।২৫	সে	যে
৮০।২০	সচিত	সূচিত
৮৩।৩, ৭	Sin	Six
৮৩।৬	Kamasutro howing eutracted	Kamasutra having extracted
৮৩।১৯	bew	bow
৮৩।২০	scuiptures	sculptures
৮৩।২১	Waddelle's	Waddell's
৮৩।২২	ক্রামরিস্	ক্রাম্‌রিশ্
৮৫।১১	°শ্রুতামি	°শ্রুতানি
৮৫।২১	সুনিশ্চিত	সুপণ্ডিত
৮৬।৫	তাহারা	তাঁহারা
৮৬।১২	তাহরে	তাহার
৮৭।৩	গৌড়িয়	গৌড়ীয়
৮৭।৫	সন্দর্ভশুম্বিং গিরিং	সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
৮৭।৭	প্রময়ে	প্রমেয়
৮৭।৭৮	গোবর্ধনঃ সন্ধষ...পতি	গোবর্ধন স্পর্ধী...পতিঃ
৮৭।১০-১৮	°ঙ্কুর-স্কুরৎ	°ঙ্কুর-স্ফুরৎ
৮৭।১৯-২০	°ঙ্গনা স্তনৈণ	°ঙ্গনা-স্তনেন
৮৮।৮	ভগবদগুণ	ভগবদ্‌গুণ
৮৮।১৮	বিবশোষিত	°র্ব্বিভূষিত
৮৮।১৯	বসতে ভিক্ষা	বসতেভিক্ষা
৮৯।১০	ধারনায়	ধারণায়
৮৯।১৮	ক্রামরীস	ক্রামরিশ

পৃষ্ঠা / পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৯।২১	জনশ্রুতি	জনশ্রুতি।
৯০।৯	বাঙ্গাল-চরিত্র	বাঙ্গালী-চরিত্র
৯০।২৬	তারানাথ	তারনাথ
৯১।৯	ধীমান	ধীমান্
৯১।১৯	ক্রামরীস	ক্রাম্‌রিশ্
৯২।৬	”	”
৯২।৮	গঙ্গমূর্ত্তি	গঙ্গামূর্ত্তি
৯২।১২	যাহারা	যাঁহারা
৯২।২২	তারানাথের	তারনাথের
৯৩।৬	ধীমানবীতপালের	ধীমান্-বিত্‌পালের
৯৩।১৪	ক্রামরীস	ক্রাম্‌রিশ্
৯৩।১৭	সঞ্চয়ে	সময়ে
৯৩।২৪	কাষ্ট	কষ্টি
৯৩।২৬	মিশ্রনোৎপন্ন	মিশ্রণোৎপন্ন